প টল ডা ঙা র

পাঁ চা লী

যুবনাশ্ব

পটলডাঙার পাঁচালী

সেঞ্চুরী প্রেস   কলিকাতা ১৩

প্রথম সংস্করণ
ভাদ্র ১৩৬৩

প্রচ্ছদপট
সত্যজিৎ রায়

ছবি এঁকেছেন
মাখন দত্তগুপ্ত

প্রকাশক
মানিক মুখোপাধ্যায়
সেঞ্চুরী প্রেস
৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেন্যু,
কলিকাতা ১৩

মুদ্রক
শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা ১৩

দাম দু'টাকা চার আনা

সূচীপত্র



রবিবারের অলস দুপুর। চারিদিক নির্জীব, ক্লান্ত। গাছের ডালে কাকটা অনেকক্ষণ পর-পর অবসন্ন ভাবে মাঝে-মাঝে ডাকছে।

চারিদিকের এই শ্রান্ত-শান্তির মধ্যে আলস্য নেই, ওই ভিখিরির দলের। দল বেঁধে, কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে, তারা দোরে দোরে ঘুরছে। রবিবারেই তাদের যা কিছু রোজগার। দলের প্রায় সবাই মেয়ে।

আর ক্লান্তি ছিলনা তার, যে ওই ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর ধ্বংসপথের যাত্রীদের মাথার ওপরে আগুন ঢালছিল! খাঁ-খাঁ রোদে পথঘাট তেতে উঠেছে, হাওয়ায় গা ঝলসে যাচ্ছে—মাথার চাঁদি ফাটবার যোগাড়!

কিন্তু ভিখিরির আবার রোদ-বিষ্টি! পেট চালাতে হবে ত?

সম্প্রতি রাস্তা দিয়ে যারা চলেছে, তারা হচ্ছে পটলডাঙার দল। দলের মধ্যে সব গোনা-গুন্‌তি। বাইরের কেউ যে ফাঁকি দিয়ে এসে দলে ঢুকে তাদের সাথে রোজগার ক'রে যাবে, তার যো'টি নেই। মোড়ল খেঁদি-পিসীর এমনি কড়া নজর! এইতো সেদিন হাটখোলার কুসুম এসে ভিড়ে গিয়েছিল, তা নিয়ে কি কাণ্ডটাই না হ'ল! খেঁদি তো বেটিকে খুন করতে বাকি রেখেছিল!

দলের সবাই তাকে ভয় করতও যেমনি, নামও তেমনি আশে পাশের পাঁচখানা পাড়ার সব দলই জানত।

এ-হেন ডাক-সাইটে খেঁদির দল চলেছে আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরে। সামনেই একটা বড় বাড়ি দেখে সবাই হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়ল। কাচ্চা-বাচ্চা কতকগুলো চাপা পড়বার উপক্রম হয়েছিল, চ্যাঁ-ভ্যাঁ ক'রে কাৎরে উঠল। বড়দের মধ্যে এই সূত্রে একটা কুরুক্ষেত্র হয়ে গেল। কিন্তু আসল ব্যাপারটা অর্থাৎ ভিক্ষে পাওয়াটা তখনো বাকি, তাই লড়াই বেশি দূর গড়াল না।

— হরেঃ কেস্‌্টা,— ছুটি ভিক্ষে পাই বাঁবা!

— এই-য়ো— ঠার্ যাও, উধার্— মৎ আও— মাং আও—

দরওয়ানজীর হুমকীতে আর কেউ বেশি দূর না এগিয়ে ওইখানেই থেমে গেল। তারপর আঁচল, কোঁচড়, থলে, যার যা ছিল, সবাই তাই পেতে, সিকি-মুঠো ক'রে চাল নিয়ে আবার রাস্তায় নেমে পড়ল।

বাইরে এসেই খেঁদি দাঁড়াল। এটা দলের নিয়ম। প্রত্যেক জায়গা থেকে বেরোন মাত্রই সবাইকে একবার গুন্‌তি ক'রে নিতে হয়। আর সবাই যে যার মতো বক্-বক্ করতে করতে, অথবা ছেলে পিটতে পিটতে এগুলো। হঠাৎ খেঁদি চেঁচিয়ে উঠল,— এই মাগী, তু' কে লা?

যাকে লক্ষ্য ক'রে একথা বলা হ'ল, সে বুক পর্যন্ত ঘোমটা টেনে চলেছিল। কেউ তাকে আগে লক্ষ্য করেনি। তার কাপড়খানা অন্য সবার মতো অত জীর্ণ নয়, একটু ফরসাই! চলনটাও বাধো-বাধো।

খেঁদি তার হাত ধরে হিড়হিড় ক'রে টেনে একপাশে সরিয়ে নিয়ে এল। দলের দিকে ফিরে বলল, যা, যা তোরা এগো! তারপর মেয়েটির কাছে এসে বলল, তু'মাগী কোত্থেকে এয়েচিস? খেঁদি মোড়লনীর নাম শুনিস্ নি? দেখি দেখি মু'খানা তোর— ব'লে, একটানে তার মুখের কাপড় সরিয়ে দিয়েই অবাক হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকাল।

— ওমা, — এযে ভদ্দর ঘরের মেয়ে গো !

খানিকক্ষণ তার মুখে কথাই ফুটল না। মেয়েটি ততক্ষণে নিজের মুখের কাপড় আবার টেনে দিয়েছিল। খেঁদি দলের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল, ক্ষ্যান্ত, আজ তুই খবরদারী করিস্। আমি ফিরনু।

মেয়েটিকে নিয়ে সে বাড়ির পথ ধরল।

দলের সবাই একটা রহস্যের গন্ধ পেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছিল! কিন্তু ফেরবার উপায় নেই, তাহলে পিসী কি আর আস্ত রাখবে? তাছাড়া পেটের তাড়া!

গলির পর গলি, সরু, মোটা, আবছা, অন্ধকার নানা রকম রাস্তা পার হয়ে আস্তানায় পৌঁছে খেঁদি বলল, এইবার বলতো বাছা, কোত্থেকে এয়োচো?

সার সার মাটি-লেপা অন্ধকূপ। বিশ্রী গন্ধ। নোংরা। একটা ঘর থেকে অনবরত ধোঁয়া বার হয়ে দম্ ফেলবার উপায়টুকুও বন্ধ করেছে। একটা ঘরে কে মরেছে। মড়াটা টান দিয়ে রাস্তায় ফেলে রাখা হয়েছে। একটু ঢাকাও নেই—সর্বাঙ্গ মাছি ও পোকায় ছাওয়া!

মেয়েটি দু'একবার চারদিকে তাকিয়ে ঘোমটার মধ্যেই শিউরে উঠল। তারপর, মাগো—ব'লে, সেইখানেই বসে পড়ল।

খেঁদি বিরক্ত হয়ে বলল, — কি গেরো! বলি ভিরমী গেল নাকি! কিগো ভালমানুষের মেয়ে, বলি দু'কদম হাঁটতে পারবে? চল, চল, আমার ঘরে, সেখানে গে সব বলবে চল।

ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ ক'রে দিয়ে, দিনের রোজগার চাল ক'টি ও গোটা দু'য়েক পয়সা সযত্নে এককোণে রেখে, খেঁদি এসে মেয়েটির সামনে বসল। বলল, এইবার মুখের কাপড় খোল। ওকি, কাঁদচ?

তুমি নতুন নোক বুঝি? আর তাতো বটেই, সে তো তোমার চেহারাতেই নেকা রয়েচে! তা, এমন ছুরত্ থাকতে ব্যবসা না ক'রে পথে বেরিয়েচ যে বড়? ব্যারাম পীড়ে হয়েচে বুঝি?

মেয়েটি হু'হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল।

খেঁদি মহা বিব্রত হয়ে বলল,—ভ্যালা ঠ্যাকারের মধ্যে পড়নু যে! এযে রা-বাক্যি কিছুই নেই, যা বলি তাতেই কাঁদে। বলি বাছা, সব খুলে না বললে কি ক'রে বুঝব? আর, তা না হ'লে ঠাঁইও তো পাবেনা এখানে! বাইরের মানুষের হেথা থাকবার নিয়ম নেই। তুমি যদি দ'লে ভর্তি হও, তবে অবিশ্যি থাকতে পাবে। ঘর নিজেই গড়ে নাও, চাই আর কারো সাথে বকরা ক'রে থাকো, সে তোমার ইচ্ছে! কিন্তু আগে সব শোনা দরকার তো?

মেয়েটি অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ ক'রে ফুঁপিয়ে কেঁদে, নাকের জলে চোখের জলে এক হয়ে যা বলল, তার মর্ম :

সে পাড়াগেঁয়ে গেরস্ত ঘরের বউ। সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে, তেমনি এক পুরুষের সাথে কলকাতায় কালীঘাট দেখতে আসে। তার সাথী তাকে নিয়ে এসে মানিকতলা খালের কাছে এক বাড়িতে রাখে। একদিন বেড়াতে যাবার নাম ক'রে তাকে নিয়ে, নেবুতলার এক বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে সরে পড়ে। গয়নাগাঁটি টাকাকড়ি যা ছিল, সব সে নিয়ে গেছে। গলার একটা মালা ছিল, তা সেই নেবুতলার বাড়িউলি কেড়ে রেখেছে। তার সাথী চলে যাবার পর প্রথমটা সে কিছুই বোঝেনি। বাড়িউলি তাকে নানারকম আশ্বাস দিয়েছিল। দিন দুই থাকবার পর, একদিন রাত গোটা এগারোর সময় তার ঘরে দু'জন মাতাল ঢোকে। সে ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে।

জ্ঞান যখন ফিরে এল, তখন সকাল হয়েছে—তারা ফিরে গেছে।

বাড়িউলি এসে বলল,—কি বাছা, খবর ভাল তো?

তার কথা কইবার শক্তি ছিল না। বাড়িউলি আগের দিনই তার হারটা দখল করেছিল, কাজেই জবাব না পেয়ে বিশেষ মেজাজ খারাপ করল না। বরং বলল,—তা ঘুমোও বাছা! পেথমদিন; একটু কাহিল তো লাগবেই!

বেলা গোটা দশেকের সময় মনের ও শরীরের অসহ্য যন্ত্রণায় সে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। কোন্ পথ তার খোলা আছে? সে কয়বাড়ি আশ্রয়ের চেষ্টা করল। সবাই কেমন ক'রে যেন তাকায়, সব শুনে ফিরিয়ে দেয়। সব পথ বন্ধ। ভিক্ষেই করতে হবে! কিন্তু একা-একা নতুন মানুষ, ভেবে কূল পাচ্ছিল না, তাই পথে এসে দাঁড়িয়েছিল। বড়বাড়ি থেকে পটলডাঙার দল বার হ'তেই তাদের সাথে গিয়ে জুটেছিল। ভেবেছিল, এতবড় ভিখিরির দলে মিশে থাকলে কেউ তাকে লক্ষ্য করবে না।

খেঁদি বলল, তা— তোমার গে, বাছা, আমাদের দলে যাদের দেখলে, সবাই তো ওই করতো এককালে! পরে, বুড়ো হয়ে, কেউ ব্যারামে পড়ে, পতে বেরিয়েচে। তোমার এই বয়েস, অমন চেহারা— তা বাপু নিজে বোঝ।

মেয়েটি ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

এবার আর খেঁদি কান্না শুনে খিট্-খিট্ ক'রে উঠল না। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কি ভাবল। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আচ্চা, থাকো! কিন্তু এ চেহারা নিয়ে কোলকাতা হেন জাগায় কি সামলে

থাকতে পারবে ? আমার খবরদারীতে যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ অবিশ্যি ভয় নেই। কিন্তু সব সময় তো আমিও চোক-রাখতে পারবো না ?

মেয়েটি আবার চোখে আঁচল দিতেই খেঁদি বলে উঠল,—আচ্চা, আচ্চা। ভয় নেই ; কেউ তোমার কিছু করতে পারবে না। আমি একা থাকি, এইখেনেই দু'জনে থাক্‌ব 'খন।

মেয়েটি পটলডাঙার দলে ভর্ত্তি হয়ে গেল।





খেঁদি-পিসীর পটলডাঙার আস্তানা। মোড়লনী ছাড়া আর সবাই এক ঘরের বাসিন্দা।

পটলডাঙার ভিখিরী-পাড়া। প্যাচ্‌পেচে পাঁকের ভেতর ছোট ছোট ভাঙা কুঁড়ে, সার সার, গায়ে গায়ে লাগান।

রাতদুপুর। সোজা হয়ে দাঁড়ালে মাথায় ঠেকে এমনি একটা হোগলার কুঁড়ের অন্দর। এক কোণে দেয়ালের গায়ে বছর দুয়ের পুরোনো একটা ছেঁড়া ক্যালেণ্ডারের ছবি গোঁজা। দেয়ালে এখানে সেখানে দড়ি টানানো, তাতে ছেঁড়া কাঁথা, নোংরা ঝুলি, এই সব। জানালা একটিও নেই, দোরে ঝাঁপ-টানা। দোর-গোড়ায় একটা কেরোসিনের ডিবে থেকে মিটমিটে আলো ও অনর্গল ধোঁয়া বেরুচ্চে। ধোঁয়ার গন্ধ, বাইরের পচা কাদা ও নোংরা আস্তাকুঁড়ের গন্ধ ; ঘরের পেছনে দিন দুই হল একটা কুকুর মরে পচে আছে, তার গন্ধ—আর কুঠে বুড়ির গলিত ঘায়ের গন্ধ একসাথে ঘরটাকে ভরে রেখেচে।

স্যাঁতসেতে মাটির মেঝের ওপর ছেঁড়া মাদুর, খবরের কাগজ, তালি দেয়া কাঁথা,—যার যেমন জুটেচে, পেতে, ফকরে ও সদি ছাড়া ঘরের আর বাসিন্দা কটি সার সার পড়ে আচে। ধনুকের মতো বেঁকে দেয়ালের ধারে নুলো হাঁ করে ঘুমোচ্চে, তারই পাশে কুঠে বুড়ি।

ঘায়ের যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে সে উসখুস করচে। তার পাশে খানিকটা জায়গা খালি। সেটা সদির গের্দ। তার এ-ধারে কানা-গুবরে কানা-চোখটা মেলে নাক ডাকাচ্চে। মাঝে বাকি জায়গাটুকু খালি। এধারের বেড়ার গায়ে খালি ভুঁয়ে উপুড় হয়ে পড়ে নফর, কি একটা কুৎসিত রোগের যন্ত্রণায় কাৎরাচ্চে।

ঝাঁপ ঠেলে সদি ঘরে ঢুকল। তার বাঁদিকের গালের মাংস নেই—দু'পাটি দাঁত দেখা যাচ্চে। চিবি কপালের ওপর উষ্কখুষ্ক চুলগুলি বিঁড়ে করে বাঁধা। পরনের ছেঁড়া কানিটা একধারে অনেকটা উঠে গেচে, আর একধারে হাঁটু পর্যন্ত নাবানো। গায়ের শতছিন্ন আঁচলটা না থাকারই মতো।

তার মুখে কোন ভাবের ছাপ পড়ে না, কিন্তু চোখের কোলে তখনো জলের ছাপ শুকোয় নি।

ঝাঁপ ঠেলার শব্দে কুঠে বুড়ি চোখ মেলল।

কুঠে। মর্ মর্! —মাগো?

নুলোটা পাশ ফিরল। একটা ধনুক যেন বাঁ-কাত থেকে ডান কাতে ঘুরে এল।

কুঠে। উহুঃ!…উঃ উঃ…

নুলো। (গলা তুলে) লাগল?

কুঠে। (যে হাতটা তখনও খসে পড়েনি, সেইটে দিয়ে নুলোর মুখে এক থাবড়া কসে)…মর…মর! যমও তোকে ভুলে আচে…

সদি। আহা বকিস কেনে? ওকি আর জেনে গুঁতো দিয়েচে তোকে?

কুঠে। রূপুসি! কেলি শেষ করে দুপুর রাতে কোঁদল করতে

এলেন। বলি, রূপ দেকে ক'জনার মন মজ্‌ল লো, ক'জনার ট্যাঁকে হাত বুলোলি ?

সদি। মর মাগি! ভালো কতা বলনু তো খেঁকিয়ে এল দ্যাক!

মার খেয়ে নুলো বুড়িকে আঘাত করার জন্যে হাত ছুঁড়তে লাগল। কিন্তু আঘাত যথাস্থানে পৌঁছোতে হলে যে রকমের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকা আবশ্যক, তা তার ছিল না,—তাই তার আকুলি বিকুলিতে বিকৃত অঙ্গগুলো শুধু তিড়িক-তিড়িক করে লাফাতে লাগল।

নফর। (গোলমালের শব্দে কাৎরে উঠল) উঃ......

সদি। আহা, তু' অমন খালি ভুঁয়ে পড়ে গড়াচ্চিস ক্যানে রে! কাঁতা কোতা ?

নফর। (যন্ত্রণা-বিকৃত মুখে)...হোতা!

সদি দড়ীর ওপর থেকে কাঁথা নামিয়ে এনে, পেতে, নফরকে তার ওপর শুইয়ে দিয়ে, নিজে পাশে বসল।

নফর। সদি, তু' এত রাত জেগে যে ?

সদি। বাইরে গেছনু।

নফর। একন ?

সদি। হ্যাঁ।

নফর। ক্যানে ?

সদি। পিসীর তাড়ায়।......কাল থেকে দস্তুরী দিতে পারিনি, বললে, খেতে দোব না!

নফর। হুঁ।...আজ খাস্‌নি তামাম্‌ দিন ?

সদি। না।

নফর। তা, ঘুরে এলি, হোলো কিছু ?

সদি। ছাই! ওরা আবার কবে কাকে পয়সা ছ্যায়!···আরো হুমকি দিলে যে, থানায় নে যাবে! (কণ্ঠস্বর অশ্রুরুদ্ধ হয়ে এল)।

নফর। কারা? কে হুমকি দিলে রে?

সদি ফোঁপাচ্ছিল, জবাব দিল না।

নফর। ভিখ্ মাঙ্‌তে যাসনি? তবে কোতা গেছ্‌লি?

সদি। তাই ত' গেছনু! পতে···এক ব্যাটা কনেষ্টবল—

নফর। কনেষ্টবল!

সদি। হ্যাঁ। ঝিমুচ্ছিল। আমায় দেকে বললে, পয়সা দেবে। সারাদিন দানা নেই পেটে, আমার কোনো সাড় ছিল না। পয়সা দেবে শুনে···

কুঠে। (খিল-খিল ক'রে হেসে) কত দিলে লা? মরি মরি··· যে রূপ···বলি, দিলে কত?

সদি। (বুড়ির কথায় কান না দিয়ে নফরকে) তোর আজ খুব কষ্ট হচ্চে, না? কাৎরাচ্চিলি যে!···সেই যে মলম নে এইছিলি কাল, লাগাস নি?

নফর। কি ক'রে লাগাব,···উঠিই নি ত' সারাদিন!

সদি। কোতা আচে? দে,···আমি নাগিয়ে দি···

মলম এনে সযত্নে নফরের ঘায়ে দিয়ে দিতে লাগল।

নফর। (একটু আশ্চর্য হয়ে, আপন মনে) তু'···তুই খাসনি সারাদিন,···না!···হুঁ!

সদি। আরাম লাগচে একটু?

নফর। খুব।···সদি···

সদি। কি?

নফর। তু' আমদানীর, না হেতাকার রে?

সদি। হেতাকার।

নফর। আমি আমদানীর। বাঁকড়ো জেলায় ছেল' আদৎ বাড়ী। সে বছর মরকে সব গেল,—বাড়ীঘর—গরুবাছুর—মা-বাপ—সব। কতইবা বয়েস তকন,—এই বছর ছ'-সাত হবে! পাড়ার কেষ্টধনের সাতে চলে এনু কোলকাতা গতর খাটিয়ে খাব বলে!—তা-পর...

সদি হাঁটুতে মাথা রেখে শুনছিল। হঠাৎ গুবরের মেলা-চোখটার ওপর নজর পড়তেই আঁতকে উঠল।

সদি। মাগো!...

নফর। কি রে?

সদি। না, কিচ্ছু না। ওই গুবরেটা! প্যাঁট প্যাঁট করে চেয়ে ঘুমুচ্চে!

নফর। ওটা কানা চোকটা রে,—চেয়ে নেই।

সদি। আচ্চা! তা'পর—

নফর। বলি। কোলকাতা এসেই দলে ভিড়ে গেনু। পকেট-মারায় হাতে-খড়ি দিয়ে ধীরে-সুস্থে ভারী কাজেরও মহড়া দিতে সুরু কন্নু। বছর খানেকের মধ্যে বারচারেক ফাটক থেকে ঘুরে এনু!—চোককান ফুটল...

সদি। হেতা জুটলি কি ক'রে?

নফর। জানের দায়ে। আগের দলে পুলিশের নজর পড়ল কড়া, ট্যাঁকা গেল না!

খানিক তু'জনেই চুপ ক'রে রইল। কুঠে বুড়ির আবার ঝিমুনী এসেছিল! একটা আরসুলা নফরের পায়ের ঘায়ে মুখ দিচ্ছিল, সদি তাড়িয়ে দিয়ে কাঁথাটা পায়ের ওপর টেনে দিল।

নফর। সদি!

সদি। ঘুমুস নি?

নফর। না।···জনম ইস্তক্ দলে থেকেও তোর দলছাড়া রীত ক্যান রে?

সদি। (অবাক হয়ে) কি?

নফর। তু' ত' আর সবার মতো নোস? আর কেউ আমায় একটা আহা-ও বলেলি এ্যাদ্দিন!···

সদি জবাব দিল না। হতভম্ব হয়ে বোকার মতো নফরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

নফর। একটু আবছা-আবছা আমার একজনের কতা মনে হয়। খুব ছোট বেলা,···আমার বাপ যকন আমায় ধরে পিটত,···সে তকন আমায় নিয়ে ষাট-ষাট করত,···খেতে দিত!

সদি। কে?

নফর। বেশী মনে নেই। এক একবার মনে হয়। বোধ হয় আমার মা।

আবার দু'জনে চুপ করল। নফর একমনে ক্যালেণ্ডারের ছেঁড়া ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল। অবসাদে ও ক্লান্তিতে সদির দু'চোখ ভেঙ্গে আসছিল।

ঝাঁপ ঠেলে একজন চুরচুরে মাতাল, বয়স বছর তিরিশ বত্রিশ হবে, ঘরে ঢুকল। বীভৎস, কদাকার মুখ, খোঁচা খোঁচা দাড়িতে অন্ধকার। দু'কস বেয়ে লালা গড়াচ্চে। সরু সরু কাঠি কাঠি হাত পা, ঠক ঠক ক'রে কাঁপচে। চোখ টকটকে লাল। একহাতে একটা ভাঙা মাটির ভাঁড়, বগলে কতকগুলো ছেঁড়া এঁটো কলাপাতা।

সে ফকরে।

সমস্ত ঘরটা তাড়ির বিকট গন্ধে ভরে উঠল।

ফকরে। মাইরি নপা !···পেল্লায় ভোজ—

নফর। কোতা রে ?

ফকরে। (এগিয়ে এসে, অঙ্গভঙ্গী করে) বসে কে মাইরি ?··· সদি !···বহুৎ আচ্ছা !···কি সোনাচ্চাদ··· হবে নাকি এক পাত্তর···

নফর। ভোজ মেরে এলি কোতা বল না !

ফকরে। ধুত্তোর ভোজ ! শ্···আলারা ! এই কলাপাতায় মুড়ে কি দিলে মাইরি চাট্টি,···বগলদাবা করে সরে পড়নু !—হেতা এসে দেকি কি না,···ভোজ, না শালার ভোজবাজী ! খালি এঁটো পাত !··· মাইরি খালি···একদম্···

নফর। সদি,···যা, শুগে' যা।

ফকরে। মাইরি আর কি,···আমরা ভেসে এইচি ! (ভাঁড়টা রেখে) নে, ধর।···অমন দশবিশ ভাঁড় উড়েচে আজ ডিপোয়···এটাও কাবার হোত পতে,—শুধু তোদের মুক চেয়ে···

নফর। খুব করিচিস। সদি যা।

সদি। (নফরের কথায় কান না দিয়ে) বগলে কি রে ?

ফকরে। (পাতাগুলো সদির গায়ে ছুড়ে দিয়ে) ভোজ !—খা, খা—(হেসে উঠল)! পাতায় ভাত-তরকারী লেগেছিল। দেখতে পেয়ে সদি আগ্রহে চাটতে লাগল।

ফকরে। মেরে দিলি ?—জবর হাবাতে হইচিস মাইরি !

নফর। ঘুমো গে' ফকরে—দিক করিস্‌নি।

ফকরে। সে কি রে !···এক পাত্তর···

নফর। না—না! বেতর ঠেকচে বড়।

ফকরে। সদি!

ভাঁড় ধরে এক চুমুকে সবটা তাড়ি নিঃশেষ ক'রে সদি উঠে দাঁড়াল।

ফকরে। কোতা চললি?

সদি। যেকানেই যাই, তোর কি!···গুয়ো কোতাকার!

ফকরে। মাগি না ধিঙ্গী!—আমার খেয়ে আমারই চোখ রাঙাবি?

সদি। একশবার। গেঁজেল ভূত কোতাকার! মর—মর!

সদির হাবভাব দেখে নফর অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল।

সদি। আ মর মিন্‌সে! চোক মা্চ্চিস যে?—হু হু বাপধন,—ওতে হয় না!—পয়সা আচে?—নগদ? ফ্যাল আগে—তা'পর!—ফ্যাল' কড়ি মাখ তেল···

ফকরে। মোক্ষম বলিচিস মাইরি! হিঃ হিঃ হিঃ। ফ্যালো কড়ি,—হোঃ হোঃ!

সদি। খিক খিক রাক।—আর আচে···নেই—মড়া,—কিপটের ডিম কোতাকার!

ফকরে। মুক সামলে কতা কোস্ সদি!—কিপটে! ফকিচ্চাদ কিপটে!—তবে কাপতেন কে বাপ?—মামার হোতা আজকের মাইফেল চালালে কে শুনি?—কুসমি, রতনা, হেবো,—ছ্যাক গে যা, এক একটা পেট ফুলে ঢাক হয়ে পড়ে আচে! দিনের রোজগার বিলকুল সাফ হয়ে গেল, এক সন্দ্যেয়—কিপটে! কোন্ শালা বলে কিপটে।

সদি। নে' নে'—ডম্‌ফাই রাক! হেবো কুসমীর পেট ফুলল,

তাতে মোদের কি এল গ্যাল রে? ঠোঁটও ত' ছাই ভিজল না! —এই নপা!—এই শুয়োর?—ঘুমুচ্চে ছ্যাক্‌!

ফকরে। আচ্চা—রোস তুই! নে আসচি আমি দু'চার ভাঁড়। ঘুমুসনি—

সদি। আমিও যাব—চল্‌।

নফর। কোতা যাবি তুই এই রেতে?

সদি। যমের দোরে। যেতা খুশী। হেতা থাকলে খেতে দিবি তুই?

ফকরে। চ' চ'—বক্‌ বক্‌ করিস পিছে—

সদি ও ফকরে বেরিয়ে গেল। নফর একটু উঃ আঃ করে পাশ ফিরে শুল।

নফর।…সদি—শোন!…চলে গেচে।

কুঠে বুড়ির ঘুম আবার ছুটে গেছিল। সে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল।

কুঠে। গন্ধ পেলুম যেন! এই মড়া, বলি আচে কিছু?

নফর। কাকে বলচিস? আমাকে?

কুঠে। তা না ত' কি ওই নুলোটাকে? সঙ! বলি, সুবাস পেনু যেন। আচে দু'এক ফোঁটা?

নফর। ফকরে এনেছ্‌ল। সদি মেরে দিয়েচে সবটা।

কুঠে। সবটা? মর মর! কি শত্তুরই জুটেচে…

নফর। কি করেচে ও তোর? তো মাগীর সব তাতেই রাগ!

কুঠে। আহ—হা! মরে যাই!—দরদ দেখিয়েচে কিনা! মলম নেপে দিয়েচে, কাঁতা টেনে শুইয়েচে,—রুপুসি!—মাইরি!—তোর মতো স্যায়না ঘাগীও যে একটুতেই—

নফর। ঘুমো ঘুমো !

কুঠে। নপা, শোন্।—মাগীর অত আদিখ্যেতা ক্যানে, ঠাউরেচিস কিচু ?

নফর। না।

কুঠে। তোর ট্যাঁকেটাকে যদি দু'একটা পয়সা থাকে···ভুলিয়ে ভালিয়ে গাপ করবার মৎলবে—

নফর। থাম্! (খানিক চুপ করে থেকে) ঠানদি! মাইরি, তু' টের পেলি কি করে ? তাই ত' বলি—

কুঠে। হেঁ হেঁ বাপ,—আমরা হলাম গে সে আমলের জীব, এ' করেই জন্ম কাটালুম !—ওসব দমবাজী কি আর আমাদের ঠেঁয়ে চলে !

নফর। (আপন মনে) তাই !—নইলে, কতা নেই, বাত্তা নেই, —খামখাই—

কুঠে। হাড়-শয়তান ! হাড়-শয়তান ! ছেনাল মাগী !—যে রুপের ছিরি,—ওই নিয়ে আবার যায় মানুষ পটাতে ! ঘেন্নায় মরি !···পিসী আজ এ্যায়সা ঠোকাই ঠুকেচে—দেকিস্ নি বুঝি ?—হোতা—পিসীর ঘরে। বলেচে,—কাল ভোরের মধ্যে যদি দস্তুরী না দ্যায়, তবে দল থেকে বার করে দেবে। খেতেও দ্যায়নি সারাদিন কিচু—

নফর। গুবরেটা মড়ার মতো ঘুমুচ্চে দ্যাক ! তকন থেকে সমানে নাক ডাকাচ্চে ! এই গুবরে !—এই কানা !

কুঠে। ডাকিস্নি, ডাকিসনি।—

নফর। ক্যানে ?

কুঠে। উটেই পোঁ ধরবে !—ওর গান শুনলে, মাইরি, আমার হাত পা হিম হয়ে আসে।

নফর। আসুক। আমরা ঠায় জেগে থাকব, আর তোফা ঘুম লাগাবে ওরা,—সেটি হচ্চে না!—এই শালা—ওঠ্ না।

কানা মোড়ামুড়ি দিয়ে ঘুমের ঘোরেই হাত বার ক'রে বিড়বিড় ক'রে বলল,—জয় হোক রাজা বাবা! একটা—

নফর। (হেসে উঠল) ঢেঁকী স্বগগে গেলেও ধান ভানে!··· এই ভূত! হেতা তোর বাবা-টাবা কেউ নেই—ওট শুয়োর!

গুবরে! (ভালো চোখটাও মেলে জড়িতস্বরে) ধুশ—শা— মাইরি—বেড়ে ঘুমটা এয়েছল!—কে ডাকচো বাবা?—ওঃ—(সুর ক'রে) গয়লা দিদি লো—ও তোর···ময়লা বড়—ময়লা বড়···

কুঠে। ওরে—রাক্ রাক্···

গুবরে। প্রাণ!

কুঠে। (নফরকে) বলেচি!—মাইরি নপা,—আমার গা জ্বলে যায় শুনলে···

গুবরে। (কুঠে বুড়ির দিকে ভঙ্গী করে তাকিয়ে)—মাইরি ঠানদি!—মাইরি? (সুর ক'রে) দাঁতে মিশি, ঠোঁটে হাসি,—ঠানদি মেরে জান্!

কুঠে। (অসহায় আক্রোশে) নপা—

নফর। (হেসে উঠল)—থাম গুবরে! বলি তোর ঘাড়ে আজ কি চেপেচে বল্ ত! ষাঁড়ের মত ঘুমচ্চিস?—খুব টেনেছিলি বুঝি?—

গুবরে। পায়সা লাগে, সোনার চান, পয়সা লাগে! খুব টানবার কড়ি পাব কোতা?—তা নয়। অমনি ঘুমই আমার খুব জমাট—

কুঠে। (আপন মনে, অস্ফুট স্বরে) কবে যে একেবারে ঘুমুবি!

গুবরে। (নফরকে) কুটে মাগী কি বলে রে ?—বিড়বিড় করচে ছ্যাক না ?

কুঠে। কি ! যত বড় মুখ না তত বড় কতা !--কুটে মাগি ! বলি তু' কোতাকার রাজপুত্তর এলি রে !—নিজের ছুরৎ দেকিস্ না ! —ঘাটের মড়া !—

গুবরে। চোপ !—মু' খারাপ করিস নে, খবর্দার !—দোব গেলে চোক ছুটো···আমার পরী রে !

অসহায় অবস্থার কথা মনে হয়ে বুড়ির স্বর নরম হয়ে এল।

কুঠে। (নাকিসুরে) তা ত' বলবিই রে—একন ত' যা তা বলবিই ! ছেলে বিয়োলে তোর মত ছু'দশ গণ্ডা কানার জন্ম দিতুম আজ,—তুই কি না—

গুবরে। তা—তা—তা তাই-নাকি !—তা ছুঃকু কি !—হাল ছাড়িস নি !—

নফর ও গুবরে পরমানন্দে বিকট উচ্চহাস্য করে উঠল। কুঠে বুড়ী বিড়বিড়ি করতে করতে পাশ ফিরে চোখ বুজল।

গুবরে। ফকরে ফেরেনি ?—সদি কোতা ?—

নফরে। কোতা মরতে গেচে !—উঃ হু রে !—উঃ—(যন্ত্রণাব্যঞ্জক মুখভঙ্গী করল)

গুবরে। কি রে !

নফর। কিছু না ! এই কোমরের ঘা-টা—

গুবরে। তড়পাচ্চে ?—যেমন কম্ম।—একটুতেই হুস হারাবি তুই —কৈ বাবা !—আমরাও ত' বাকী রাকিনি কিছু—আমাদের ত' কখনো—

নফর। মোড়লি রাক্ষ ঘুমো।

গুবরে। যেমন বাচবিচার নেই—

নফর। ঘাঁটাসনি!—যদি ভালো চাস ত—

গুবরে। ইঃ—কি করবি! বলব না?—একশ' বার বলব, হাজার বার বলব—ঘেয়ো কোতাকার—

ক্যাঁকাতে ক্যাঁকাতে উঠে নফর আচমকা এসে কানার টুঁটি চেপে ধরে তার মুখে ঘুসী মারতে লাগল। কানা প্রবলতর শক্তির কাছে অসহায় ভাবে হাত-পা ছুড়তে লাগল।

নফর। ক্যামন—ঘেয়ো—না?—কি?—

গুবরে। ছাড় মাইরি!—লাগচে।—দোহাই তোর—

নফর। মনে থাকে যেন!

ক্লান্তভাবে এসে ও নিজের জায়গায় শুয়ে পড়ল।

গুবরে। (হাঁপাতে হাঁপাতে)—শালা!—

নফর জবাব দিল না। গুবরে দম নিয়ে ট্যাঁক থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরাল।

গুবরে। (সুর করে)—জংলা পাকি—পোস না মানে—হায় হায় জংলা পাকি—নপা!—শালা ঘুমুচ্চে!—আবার আমায় বলে কিনা ষাঁড়!—জংলা পোসা হোলো দায়!—হা রে—জংলা পোসা—

বিড়িটানার সাথে সাথে সুর ভাঁজতে লাগল গুবরে। বাইরে ফকরের আওয়াজ শোনা গেল: মাইরি?—কদ্দিলে? আট আনা—বলিস কিরে!—ওকি ওকি—খাসনে, খাসনে!—পাঁচ ছ' ভাঁড় ত' আগেই সাবাড় করিচিস—

কথা কইতে কইতে ফকরে ও সদি ঘরে ঢুকল! সদির হাতে এক

ভাঁড় তাড়ি। মুখ চোখ শুকনো···ফোলা ফোলা। হাতপা থরথর করে কাঁপচে। ঘরে ঢুকে সে ভাঁড়ের তাড়িটুকু গলায় ঢেলে, টলতে টলতে কুঠে বুড়ির পাশে নিজের জায়গায় ধপাস করে শুয়ে পড়ল। শুয়েই বুড়ির মাথার কাছে হড়হড় করে খানিকটা বমি করে ফেলল।

ফকরে এসে বেহুঁসের মতো গুবরের ধারে মাটীর ওপর উপুড় হয়ে পড়ল।

গুবরে। কি বাবা মাণিক-জোড়!—খুব লুটে এলে!

ফকরে। ওই বেটি—মাইরি!—পিপে! আমার চারগুণ—

সদি। মিচে ক—অথা কোস্‌নি কো—ও—ওয়াক!—ম—ওটে ত' ছ' ভাঁড়—

গুবরে। বাহবা!—বেঁচে থাক মাইরি,—পিসীর মুক রাখতে পারবি!—

ফকরে। শুধু তাই—আবার রোজগারও করে এল এর মধ্যে—

সদি ছু'একবার ওয়াক ওয়াক করে জড়িতস্বরে কি বলল বোঝা গেল না। একটু পরেই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়ল।

ফকরে। নপা ঘুমুচ্চে!—ওকি—ডিবেটা জ্বলবেই!—সেই সন্ধ্যে থেকে?—নেবা—নেবা। (ছেঁড়া কলাপাতাটা কুড়িয়ে নিয়ে তাই দিয়ে বাতি নিবিয়ে দিল)—রাত পুইয়ে এল বোধহয়!—কাক ডাকচে!—

গুবরে। অত ভাবনা কি বাবা! পিসী কড়ি আদায় করতে আসবে, তার আগে রাত পোয়ালেই বা কি, আর না পোয়ালেই বা কি?

ফকরে। তারও······! দেরী নেই! ময়লা গাড়ী চলচে পতে—

গুবরে। বয়ে গেচে।

একটু উসখুস করে দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘর অন্ধকার, ঘুটঘুটে। বাইরে একটু একটু করে ফর্সা হচ্চে। রাস্তা দিয়ে ঘটাঘট করে ময়লা ফেলা এক্কা চলতে সুরু করেচে। কুঁড়েটার মধ্যে সব চুপ। বাইরে রাতের সুপ্তির পর সদ্যোস্থিতা নগরীর জাগরণ কোলাহলের সাড়া পাওয়া যাচ্চে। কিন্তু প্রভাতের সজীবতা এখনো পটলডাঙার পচা পাঁকের পাহারা পেরিয়ে আস্তানার কুঁড়েগুলোর ভেতরে উঁকি দিতে সাহস পায়নি।

এমনি ঘণ্টাখানেক।

কুঠে বুড়ির ঘুম ভেঙেচে সবার আগে। বন্ধ ঘরে চোখ মেলে, খানিক ধন্দ ধরে থেকে আঁধার সরে গেলে পর, তার নজর পড়ল সদির ওপর।

কুঠে। মর, মর !···সারারাত কেলি করে গড়ানো হচ্চে ছ্যাক্‌না ! বলি অ' রুপুসি !—বেঁহুস হয়ে ঘুমুচ্চে।—ঘর ম' ম' করচে গন্দে ;—কত গিলেচে !—রেকেচে কি ছাই এক ফোঁটাও !—এই নুলো ওট্ ওট্—ঢুকুর বেজে গেল যে !

উঠতে গিয়ে বুড়ির হাত ঠেকে গেল সদির আঁচলে। রাতের রোজগার আট আনা পয়সা তাতে বাঁধা ছিল ; এদিক ওদিক চেয়ে ঢোক গিলে, বুড়ি সেটা বার করে নিয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে কোনো রকমে উঠে, ঝোলাঝুলি নিয়ে দাঁড়াল।

কুঠে। দুগগা—দুগগা ! ওরে নুলো—ওঠ্।

ফকরে। (হটাৎ ঘুম ভেঙে, বুড়ির সাড়া পেয়ে) দাঁতে মিশি ঠোঁটে হাসি,—

কুঠে। (আঁৎকে উঠে)—রাম রাম !

গুবরে। কি বাবা, ভূত ঝাড়চ ?—ঠানদি মেরে জান্—হারে ঠানদি মেরে জান্ !

কুঠে। মর্ মর্ !

ঝাঁপ ঠেলে বাইরে বেরোল কুঠে।

গুবরে। চললি নাকি ? (সুর করে) গুঁড়ি সুড়ি, কুঠে বুড়ি, চোল্‌ল নিয়ে প্রাণ ! —হায় হায় !

অকথ্য ও অশ্রাব্য গালাগাল করতে করতে বুড়ি চলে গেল। গুবরে আপন মনে খুব খানিক হো হো করে হাসল। তারপর আর একবার পাশ ফিরে চোখ বুজল।

দোরগোড়া থেকে মোড়লনীর বাজখাঁই গলার হাঁক শোনা গেল : নপা, ফোকরে, গুবরে, সদি !—এই চার নম্বরের বাসিন্দারা ! —ওট্ ওট্ !

খেঁদি ঘরে ঢুকল। গুবরে উঠে বসল।

গুবরে। ধর।

খেঁদি। (পয়সা গুণে ট্যাঁকসই ক'রে) আর মড়াগুলোর হয়েচে কি ?—দে ত'—দে ত'—চুলের মুটি ধরে উটিয়ে দে সব কটাকে ! —লবাবের লাতি সব !

গুবরে সবাইকে এক একটা হাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল। ফকরে উঠে চোখ রগড়াতে লাগল।

খেঁদি। লে' লে' দস্তুরী বার কর !—কাজে বেরো। হোতা কে ওটা ? সদি ?—তবে রে মাগী, মিনি পয়সার পেয়ারি।—এই—ওট্ ওট্। (পা দিয়ে মাথায় গুতো দিল) বজ্জাত মাগী !—কই লা, দস্তুরী

কোতা ?—বার কর শিগগীর !—কালকের ছ'আনা,—আজকের ছ'আনা—

সদি। (মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে উঠে বসে) দিচ্ছি ! —গালমন্দ করিসনে সকালবেলা—

খেঁদি। ইস্ !—পূজো আচ্চায় যাবি নাকি লো ?—বলি, বড় যে—

সদি আঁচল টেনে পয়সা না পেয়ে, পাগলের মতো কাপড় চোপড় ঝাড়তে সুরু করে দিল। কাঁথা, কম্বল,—কোথাও না পেয়ে সে ডুকরে উঠল।

খেঁদি। ঝাড়ফুঁক সুরু করলি যে !—পয়সা কোতা ?—ও আবার কি ?—আ মর—

সদি। (ফোঁপাতে ফোঁপাতে) পয়সা—আমার পয়সা !—এই আঁচলে যে ছ'টো সিকি বাধা ছেল কাল রাতে !

খেঁদি। (একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে) ঢং রাক্। ওসব ভেল চলবে না হেতা ! (নীরস কণ্ঠে) পয়সা বার কর।

সদি। ঢং কি ? সত্যি মিথ্যে সুধো না ফকরেকে ! ছেল কিনা—

ফকরে। ছেল, ছেল !—মাইরি পিসি,—জবর রোজগার করছেল মাগি—

খেঁদি ! ছেল ত' গেল কোতা ?

সদি। কেও নিয়েচে !—নইলে যাবে কোতা ! (চারদিকে তাকিয়ে, ফকরেকে) তুই নিয়েছিস্ আমার পয়সা ! —বার কর—দে শিগগির— (ফকরের ওপর গিয়ে পড়ল)

ফকরে। (সদির পেটে হাঁটু দিয়ে এক গুঁতো দিল) —পালা পালা !—আট গণ্ডা পয়সা,—তাই নিতে যাব আমি ?—খেয়াল নেই, মাগি !—ফরিকচাঁদ অমন কত আট গণ্ডা উড়িয়েচে কাল একসন্দের ফুরতিতে !—যা-যা !

সদি। (গুঁতো খেয়ে ককিয়ে উঠল) —মা গো ! —তবে কি হ'ল আমার পয়সা—কে নিল ?···

কান্নায় সদির গলা বন্ধ হয়ে এল।

ফকরে পিসীর হাতে পয়সা দিয়ে বেরিয়ে গেল। নফরের ঘুম ভেঙেছিল। সে উৎকর্ণ হয়ে সব শুনছিল।

খেঁদি। (পরুষ গলায়) —শোন সদি !—যেতা থেকে পারিস নে' আয় পয়সা !—ধারে কারবার নেই হেথায় !—তা হোস না তুই বরাবরকার।—অতবড় দেহটা,—লজ্জা করে না ! যেমনি পারিস, —দিতেই হবে আজ—

সদি। (হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফোঁপাতে ফোঁপাতে) আমি ত' এনেইছিনু—তা চুরী হলে—এ নিশ্চয়ই ওই কুঠে বুড়ির কাজ—আমি—

নফর। হোলো কি পিসী ? অত রুকচিস কার ওপর ?

খেঁদি। ত্যাক না মাগীর র.ত !—ধুমসি মাগী, তু'দিন দস্তুরী ফাঁকি দিয়ে বেড়াচ্চে !—কালকের অমন ঠ্যাঙানীতেও মাগীর শিক্ষে হয়নি !—

নফর। হুঁ !—আমার দস্তুরী নিবি নে ?

খেঁদি। দে।

নফর। ধর—

খেঁদি। (পয়সা নিয়ে)—কাজে যাবিনে?—না যাস, পড়ে থাক!—ওলো অ' শতেক খেয়ারি!—ধন্দ ধরেই থাকবি, না—

খেঁদি অনর্গল গাল মন্দ করে যেতে লাগল। সদির মুখে রা ছিল না, সে মুষড়ে কেমন যেন একরকম হয়ে গেল। কিন্তু তার অস্ফুট রোদন সমান চলতে লাগল। নিজের দস্তুরী দিয়ে পাশ ফিরে চোখ বুঁজতেই নফরের চোখের ওপর থেকে নোঙরা কুঁড়ের ঘুটঘুটে অন্দর যেন ছায়াবাজীর মতো মিলিয়ে গেল। দূর অতীতের কবরের তলা থেকে একখানা মুখ তার মুগ্ধ দৃষ্টির ওপর ফুটে উঠল—বাপের ঠ্যাঙানোকে অভিভূত করে শান্তি প্রলেপের মত যার চোখের জল তার ব্যথাজর্জর সর্বাঙ্গে একদিন ঝরে পড়েছিল, মুখখানা তার।

বদ্ধ দৃষ্টির অস্পষ্ট অন্ধকারে সে একবার শিউরে উঠল। তারপর চোখ মেলে, একটু কেশে খেঁদিকে বলল,—কত পাবি ওর কাচে?

খেঁদি। চার আনা।

নফর। ওই হোতা খুঁটির পেছনে গোঁজা আচে। বার করে নেগে যা! সদি ও খেঁদি সমান অবাক হয়ে একসাথে নফরের দিকে তাকাল।

নফর। দিক্ করিস্নি যা—আ মোলো! চোখ মটকাচ্চিস কেনে।

নফর পাশ ফিরে শুল।

খেঁদি বেকুবের মতো খানিক দাঁড়িয়ে থেকে, কথিত জায়গা থেকে পয়সা বার করে নিল। তারপর সদির দিকে একটা বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বেরিয়ে গেল।

সদি বজ্রাহতের মতো একদৃষ্টে নফরের দিকে তাকিয়ে রইল। বেড়ার ফাঁক দিয়ে দিনের আলো ঘরের ভেতর আসতে লাগল।

হঠাৎ সদির সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। উচ্ছ্বসিত কান্না চাপতে চাপতে সে কম্পিত হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজল।

নুলোটা খেঁদির সাড়া পাওয়া অবধি কতকগুলো ঝুলিকাঁথার তলায় লুকিয়ে ছিল, এইবার মুখ বার করে মিটমিট করে তাকাতে লাগল।





জোয়ান মরদ ডাকু যখন রেলে পা কাটা প'ড়ে কাজের বার হ'য়ে গেল, তখন এই এত বড় দুনিয়া তাকে বেঁচে থাকবার কোনো পথই বাৎলাতে পারল না।

অনেক ঘোরা-ফেরার পর শেষ কালে, সে সোমত্ত স্ত্রীকে নিয়ে পটলডাঙার ভিখিরিপাড়ায় এসে খুঁটি গাড়ল। সেখানকার বাসিন্দারা স্থান দিতে তাকে কোনো আপত্তিই করল না, কিন্তু ওই স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কটা বরদাস্ত করতে আদপেই রাজী হ'ল না। বলল, থাকবি থাক! কিন্তু ইস্তিরী-ফিস্তিরী ক্যানো বাবা! এখেনে ও-সব চলবে না, মুড়িমিছরীর একদর হেতায়!

শুনে, ডাকুর মন এই শেষ আশ্রয়ের ওপরও বিমুখ হয়ে উঠল। বলল, শুনছিস তো ময়না? এরপর—

ময়না বলল, আর কোথায় যাবি তবে? আজ দু'মাস ত' সমস্ত পিরতীমী ঘুরে বেড়ালি, ঠাঁই পেলি কোথাও? মাথা গোঁজবার কুঁড়ে যখন মিলেচে একটা, তখন আর তোকে টো-টো ক'রে বেড়াতে দিচ্চিনে! আমার কতা? কি করবে ওরা আমার! সে জন্যে তোকে কিছু ভাবতে হবে না!

ডাকু বলল, সব বুঝলাম। কিন্তু শুনলি ত'! একে ওরা দলে ভারী, তার ওপর—

॥ কালনেমি ॥

—থাম তুই! দলে ভারী! আমার কাটারী থাকতে ওই মড়ার দলকে ভয় করি আমি?

স্ত্রীর শ্রান্ত, অনশনক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে দো-মনা ভাবে ডাকু বলল, থাক তবে! কিন্তু—

—আর কিন্তু করিস্‌নে তুই—

তারা থেকে গেল।

কিন্তু তেলে জলে যেমন মিশ খায়না, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটুকু অটুট রেখে তারাও তেমনি দলের সাথে মিশে উঠতে পারল না।

মেশবার জন্যে ব্যস্ততাও তাদের বিশেষ ছিল না। ময়না ভোরে উঠে ডাকুকে নিয়ে গিয়ে রাস্তার মোড়ে বসিয়ে দিয়ে আসত। তারপর দলের সাথে পথে বেরিয়ে পড়ত। তুপুরে স্বামীকে নিয়ে এসে খাইয়ে দাইয়ে সন্ধ্যের আগেই আবার রেখে আসত। রাত বারোটা-একটায় তাকে নিয়ে এসে তুজনে শুয়ে পড়ত। রোজকার রোজ এমনি কাটত। কারো সাথে ঘনিষ্ঠতা করবার সুবিধেও তাদের হ'ত না, ইচ্ছেও করত না। নিজেরটা নিয়েই নিজেরা থাকত।

হরিমতীর ঘরের রতনা একদিন সন্ধ্যের সময় অনেকের সামনেই ময়নাকে জড়িয়ে ধরেছিল, ও-পাড়ায় এসব নতুন ব্যাপার নয়, হামেশা হচ্ছে। কিন্তু ঠিক তু'সেকেণ্ড পরে যা ঘটল, তার সাথে পরিচয় কারোই ছিল না। তু'হাতে নাক চেপে ধ'রে ভুঁয়ে প'ড়ে রতন গোঙাতে সুরু করল। ময়না কাপড়-চোপড় ঠিক ক'রে গম্ভীর ভাবে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

রসিকতার জের স্বরূপ নাকদিয়ে পোয়াটাক রক্ত বেরিয়ে যাবার পর রতন উঠে বসল।

পটলা বলল, হয়েছিল কি রে? একটা মাগীর হাতে ম্যাড়া ব'নে গেলি?

কাৎরাতে কাৎরাতে রতন বলল, এমন আচম্‌কা ঘুসী চালালে মাইরি, তাল রাকতে পারলুম না! আর একেবারে নাকের ঠিক ডগাটায়—উঃ—

একটা বছর আটেকের মেয়ে বলল, থাক থাক—আর কতা ক'স নে! অমন ষাঁড়ের মতো মরদ—লজ্জা করে না!

তার দিকে একবার বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে রতনা বলল, আচ্চা বাবা, এক মাগে শীত পালায় না, আমিও দেকে নেব! ও শালীর ড্যামাক না ভাঙতে পারিতো—

পটলা বলল, থাক, হয়েচে। একন ঘরে যা ত'। নাক যে রক্তারক্তি হয়ে গেচে।

তীব্রদৃষ্টিতে ময়নার ঘরের দিকে তাকিয়ে রতন টলতে টলতে নিজের ঘরে ঢুকল।

যে যার গর্তে ডুব মারল।

এর মধ্যে ময়নার এক ছেলে হ'ল। ছেলে নিয়ে সে এমন মেতে উঠল যে, সবারই কাছে বেজায় বেখাপ্পা ঠেকতে লাগল। দিনরাত যত্ন-আত্তি, নাওয়ানো-খাওয়ানো, কত কি! স্বামী স্ত্রী দু'জনেই রোজগারে বেরোনো ছেড়ে দিল। পুঁজিপাটা যা ছিল, তাই ভেঙে খাওয়া চলতে লাগল।

খেঁদি-পিসীর দলে যে এটা খাপ খাবেনা, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সেখানে স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, বাপ-মা, কোনো সম্পর্কেরই

অস্তিত্ব ছিল না। প্রতি সোমত্ত মেয়েরই ফি বছর ছেলে হ'ত, একটি বছরও কামাই পড়ত না! কিন্তু ওই হওয়া পর্যন্তই। তারপর, সে সব শিশুদের ধর্মের নামে ছেড়ে দেওয়া হ'ত, দেখবার শোনবার কেউই থাকত না। বেশির ভাগই মরত, যারা হঠাৎ বেঁচে যেত তারা আর দশজনের মতো বন্ধনহীনভাবে বেড়ে উঠত। বাপ-মা'র ঠিক-ঠিকানা কেউ জানত না। তারা জানত, দলের প্রত্যেকেই যেমন একা, তারাও তেমনি।

মেয়েগুলোকে বয়স হবামাত্র নেবুতলার মতন সব জায়গায় চালান করা হ'ত! দলের এ একটা মস্ত আয়। ছেলেগুলো পকেটকাটা থেকে হাতে খড়ি পেত।

এই সেখানকার নিয়ম।

এ-হেন জায়গায় ময়না যখন তার ছেলে নিয়ে ঢলাঢলি সুরু করল, তখন সবায়ের কাছেই সেটা বাড়াবাড়ি, আদিখ্যেতা ব'লে মনে হ'ল।

থেঁদি বলল, ঘেন্না ধরালে! একি ভদ্দরনোকের ঘর নাকি লা? সোমত্ত মাগী, কোতায় দু'পয়সা রোজগারের চেষ্টা দেকবি, তা না, সোয়ামী, সোয়ামী করেই গেল! আবার একটা কাঁটা খসেচে ত' কি নাগিয়েচে দ্যাকোনা! বলি, তু' মরলে ওকি তোর ছেরাদ করবে?

ময়না শুনত সবই, কিন্তু গায়ে মাখত না।

ছেলে মাস দু'আড়াইয়ের হ'লে তারা আবার রোজগারে বেরোতে সুরু করল। বুড়ি হরিমতীর ময়নার ওপর একটু টান ছিল, সেই থাকত ছেলের পাহারায়।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় সে রাস্তার মোড়ে ডাকুকে রেখে ফিরে

আসচে। আস্তানার গের্দুর ভেতরে পা দিতেই রতন এসে তার পথ আটকে দাঁড়াল।

—কি বাবা, বড় যে তেজ ফলিয়েছিলে সে-দিন!

তাড়ির গন্ধে চারিদিক ভ'রে গেল।

ময়না বলল, পথ ছাড়্—

—ফোস কেউটের ছা, কম নয় তার হাঁ—মাইরি, ছুবলে দিয়ো না যেন! আজও কি ঘুসী চালাবে নাকি—, ব'লে সে ডাকল, পটলা—

ময়না তাকিয়ে দেখল, সামনের ঘরটা থেকে আরো দু'জন নেমে এল। তার ভয় হ'ল। কিন্তু সে ভাব চেপে সে বলল, কি চাস তোরা, শুনি?

—হুঁ বাবা, পতে এসো! গুটিগুটি ওই ঘরটিতে ঢুকে পড়ো তো যাদু, না বেইজ্জৎ হবার সক আচে?

তীব্র দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মোলায়েম ক'রে ময়না বলল, আচ্চা, একটু সবুর কর না তোরা! ছেলেটাকে ছেড়ে এইচি ঢেরখন, এক পাক তাকে দেকেই আমি চলে আসব।

পটলা বলল, যেতে দাও, যেতে দাও, ছেলে দিয়ে কি হবে? ছেলে আর দেকতে হবে না! বেঁচে থাকলে অমন কত ছেলে হবে,—ছেলের দুঃখু কি বাবা!

রতন জড়িত স্বরে ছড়া কাটল,

আমার সাগর-পারের ময়না
শিকলি বাঁধা রয় না!
দেবো চাঁদির গয়না,
যাবার কতা কয় না!

ছিঃ মানিক, অমন কতা কইতে আচে ?

ময়না দেখল মহাবিপদ। একমাত্র সম্বল ছুরিখানা, তাও ঘরে রয়েছে। খালি হাতে তিনটে পশুর সাথে লড়া ত' সম্ভব নয়।

এ-ধার ও-ধার তাকাতে তাকাতে হঠাৎ সে ছুট দিল। পটলা দৌড়ে গিয়ে তার কাপড় চেপে ধরল। কাপড় ছেড়ে দিয়ে সে আবার ছুটতে যেতেই রতন গিয়ে তার ওপর চেপে পড়ল।

—ভেল্কি দেখাবার আর ঠাঁই পেলে না ধন! চল দিকি একন সুড়সুড় ক'রে—কত ভেল্কি জানো ওই ঘরের ভেতর ছাকাবে চল—

ময়না ঝাপটা-ঝাপটি কাকুতি-মিনতি অনেক করল। কিন্তু ক্ষিদে আর পশু-লালসা ছাড়া যাদের আর সমস্ত বৃত্তিই মরে গেছে, মিনতিতে তাদের মন ভিজবে কেন ?

তিন জনে তাকে টেনে হিঁচড়ে ঘরে নিয়ে গেল।

রাত হয়ে গেছে। ডাকু পথের ধারে বসে হয়রান হয়ে উঠেচে। ময়নার আসতে এত দেরি ত' কোনদিনই হয় না ?

আরো খানিকক্ষণ ব'সে অস্থির হয়ে শেষে সে লাঠিতে ভর ক'রে উঠে দাঁড়ালো। তারপর একাই ঢিকোতে-ঢিকোতে আস্তানার দিকে চলল।

সেখানে পৌঁছেই সে দেখল, মহা হৈ-চৈ বেধে গেচে। সামনেই একটা ঘরে অনেক লোক মিলে জটলা করছে। সে আস্তে আস্তে গিয়ে পাশে দাঁড়াল।

খেঁদি বলছিল, তা এতে আর দোষের কি হয়েচে বাছা! রতনাকে তো ছুঁড়িরা পছন্দই করে! তোমার যেমন ছিষ্টিছাড়া স্বভাব!

ময়না এক কোনে এলিয়ে পড়েছিল। মাথার চুল উসখো-খুসকো, মুখ শুকনো ; চোখ দু'ইঞ্চি ব'সে গেছে।

খেঁদি বলল, একানে পড়ে থেকে আর কি করবে বাছা, ঘরে যাও। ডাকু কিছু অবুঝ নয়, সে এলে বুঝবে। তাও বলি, যেকানকার যা নিয়ম, তা মান্‌তে হবে ত' ? পেট চালাবার জন্মে পতেই বেরুতে হচ্ছে যকন, তকন কি আর সোয়ামী-ইস্তিরী ওসব ভড়ং চলে ? ভদ্দরলোকি করতে হলে তার ঠাঁই আলাদা।

ঠিক ধরতে না পারলেও ডাকু মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝল! সে নিঃশব্দে নেমে নিজের ঘরে চলে গেল।

খানিক পরে, ময়না ঘরে আসতেই সে বলল, তু' কিছু ভাবিসনে ময়না, দোষ আমারি !

ময়না বলল, তু' একটা বিহিত করবিনে ! এমনি ক'রে—

দু'হাতে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে পড়ে সে ফুঁপিয়ে উঠল।

ডাকু উঠে তার কাছে এগিয়ে এসে বসল। একটু চুপ ক'রে থেকে তাকে বুকে সাপটে ধ'রে লালসাজড়িতস্বরে বলল, তা হোকগে,— থাকতেই হবে যকন হেতায়, তকন কি হবে ঘাঁটিয়ে !—আয় তুই—

ময়না অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল।

তার মুখে মরমীর দরদের ছাপ একটুও নেই, আছে কেবল তপ্ত ভূখের জ্বালা ! মত্ত পশুর মতো দু'চোখ জ্বলছে।

—রতনা তো ? আর কেউ ছেল' ? ব'লে ডাকু তাকে কোলের ওপর টানতেই সে গা ঝাড়া দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। তারপর একহাতে চোখের জল মুছে আরেক হাতে গায়ের কাপড়টা টেনে সে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

অস্ফুট শুষ্ক গলায় ডাকু বলল, কোতা চললি ময়না ?

—রতনার কাছে—

সে চলতে সুরু করল !

যেতে যেতে সে শুনতে পেল ডাকু বলচে, দোহাই তোর, একটি বার আসিস রেতে—





সন্ধ্যের মহড়ায় চোরের মতো ইদিক-উদিক তাকাতে তাকাতে সন্তর্পণে আস্তানার গের্দয় পা দিতেই বাঙ্গার কানে এল খেঁদি-পিসীর কটকটে বাজখাই গলার আওয়াজ, কি রে মড়া, হয়েছে কি ? অত হাঁপাচ্চিস কেনে ? কি ওটা তোর কাঁকে ?

—চুপ, চুপ্—চ' উদিগে, ঘরের ভেতর বলচি—

—আ মর্ ! কি এমন রাজ্যি জয় করে এলি যে— ওমা ! উকি রে ! কার ছ্যানা—

—মাইরি পিসী, দোহাই তোর ! ঘরে চ'—মহাকাণ্ড হয়ে গেচে !

বাঙ্গা তখনো প্রাণপণে হাঁপাচ্ছে। তার কাঁখের পোঁটলা থেকে অদ্ভুত গোঙানীর শব্দ হতেই সে পটাপট দু'তিনটে থাবড়া ক'সে অস্পষ্ট ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, থামনা শূয়োর—একেবারে গলাটিপে ঠাণ্ডা করে দেব—

তারপর সভয়ে বার দু'তিন পেছনে তাকিয়ে বলল, চ' পিসী—

ঘরে ঢুকে, ঝাঁপটা টেনে দিয়ে খেঁদি বলল, নে' একন, বার কর দিকি কি এনেচিস—

বাঙ্গা টিপ করে কোল থেকে বছর চার-পাঁচের একটি ফুটফুটে ছেলেকে ঘরের মেঝেয় নামিয়ে দিলে। ছাড়া পেয়ে ছেলেটা আর একবার কেঁদে উঠতেই সে তার গলা টিপে ধ'রে ঠাস করে গালে একটা

চড় কসিয়ে দিয়ে বলল, চুপ, হারামজাদা, চুপ! ওই একরত্তি জীব, দাপট ছ্যাক্ না!

বেধাবড়া ধমক আর মারের দৌলতে ছেলেটির স্থবুদ্ধি হয়েছিল, সে সত্রাসে চুপ করল।

খেঁদি ছেলেটির দিকে তাকিয়ে ত্যক্ত ভাবে বলল, করচিস কি! দলশুদ্ধ হাতে দড়ি দেয়াবি নাকি?

বাঞ্ছা বলল, দলফল যাক চুলোর দোরে, নিজের হাত দুটো ত' বেঁচেচে! বাপ্ আর একটু হলেই—

খেঁদি তার দিকে বিরক্ত চোখে তাকিয়ে বলল, নে, কপচাস্ পরে, কি হয়েছেল বল্—

—বলচি। রাজাবাজারের মোড়ে ওই যে বড় বাড়িটা না, ওই যে লাল রঙের দেউড়িওলা—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, পরামানিকের বাড়ি—

—ছোঁড়াটা হোতাকার। সন্দের আগখানটাতে খেলতে খেলতে খানিকটা ইদিকে এসে দাঁড়িয়েছেল। আমি আসছিনু শ্যালদা'র দিক থেকে। হঠাৎ নজর পড়ল ছোঁড়ার গলার দিকে। দেকি কি, গ্যাসের আলোয় গোট গোট কি যেন ঝক্মকিয়ে উটল! ভাবনু, সাপ-ব্যাঙ যাই হোক বাবা, ও আমি না হাতিয়ে ছাড়চিনে! ছোঁড়া আপন মনে চলছিল, আমিও মৎলব ভাঁজতে ভাঁজতে ওৎ পেতে সাত ধরনু।

—নিকুচি করেচে তোর সাত-ধরার, মাল সড়ালি কি করে তাই বল্—

—ভড়কে দিসনি পিসী, বলচি। শীক-কাবারের দোকানের পাশের এঁদো গলিটার মুখে এসে যেই ছোঁড়া দাঁড়িয়েচে, আমিও ওমনি

না তাক বুঝে, এক লাপে ওঁর ঘাড়ের 'ওপর! মুক চেপে ধ'রে হিড় হিড় করে নে' এলুম গলির ভেতর! ছোঁড়ার তকনকার ভাবখানা যদি দেকতিস পিসী! ঝট্‌পট্‌, কেতেন চিতেন, টোপগেলা বোয়াল-ছানার মতো দাপাচ্চে! হারটা পেরায় কায়দা করে নে' এনেচি, য়্যামন সময় দেকি একব্যাটা লালপাগড়ি গলির ঠিক মুকটাতে, চোক ত' চড়কগাছ! জান থাকতে অমন রোজগারটা ভেস্তে যাবে, মাইরি আর কি! কিন্তু সাত-পাঁচ ভাববারও ত' আর সময় নেই, শালা এগুচ্চে! বোঁ করে ছোঁড়াটাকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নে' 'ওর জিবটা না টেনে ধরে দিনু ছুট! ছুট ত' ছুট—একদম আস্তানার গের্দয় পা দিয়ে তবে হাঁপ ছেড়িচি! —বাপ! কম ভুগিয়েচে গুয়োটা! আর শালার কি 'ওজন পিসী, এই তোর গা ছুঁয়ে বলচি, মাইরি, দেড়মনের কম হবে না! কালঘাম ছুটিয়ে দিয়েচে!

খেঁদি সব শুনে, খানিক চুপ ক'রে বসে থেকে বলল, আচ্চা, নিয়ে ত' এলি, একন সামাল দিবি কি করে? কচি কাচা নয়, পুরষ্ট মাল! হুজজুৎ বাদালি তুই!

বাঙ্গা বল্‌লে, হুজজুৎ আর কি! হারটা খুলে রাক, তা'পর রাতারাতি ওকে পার করে দিয়ে আসি ফটকের কাছে—

খেঁদি বিরক্ত হয়ে বলল, বলিহারি তোর বুদ্ধি। এতক্ষণ বাড়িতে সরগোল পড়ে গেচে না? ওদিক মাড়ালেই ত' হাতে বেড়ি পড়বে। তা ছাড়া ছোঁড়াটাও তো আর চোক-কান বুজে নেই, অনেক কতা ত' 'ওই ফাঁস করবে!

—ফাঁস করবে না আমার এ করবে! রাস্তাঘাট চেনা কি ওর কম্ম, ওইটুকু ত' ছোঁড়া! তোর যত গুলিখুরী—

—তোর পিণ্ডী! আস্তানাটা তো দেকচে, একটু বললেই পুলিশে টের পাবে। চক্কুর লীলে-খেলা ত' আর বেশি দিনের কতা নয়—

জবাব দেবার কিছু নেই। বাঙ্গা চুপ করল।

খানিক ধন্দ ধ'রে থেকে খেঁদি বলল, আমি বলচি—

হঠাৎ একটা চুমকুড়ী কেটে বাঙ্গা চেঁচিয়ে উঠল, ঠিক, ঠিক, হয়েচে! শোন—

দাঁত কিড়মিড় করে খেঁদি বলল, আস্তে মড়া, আস্তে!

বাঙ্গা সামলে নিয়ে গলা খাটো করে বলল, আচ্চা। তারপর খেঁদির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস-ফাস সুরু করল। সারা হলে, মুখ সরিয়ে এনে, হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলল, কি বলিস্?

খেঁদি একলহমার জন্যে একটু শিউরে উঠে, বিকৃত স্বরে বলল, বেশ বেশ! আর তা ছাড়া পতও ত' দেখিনে কিছু!

ছেলেটা অনেকক্ষণ ভয়ে ভয়ে চুপ করে ছিল, এইবার খেঁদির আঁচল ধরে ফুঁপিয়ে উঠল,—মা—মার কাছে যাব!

খেঁদি চমকে উঠে চোখ কটমটিয়ে তার মুখের দিকে তাকাল।

—যাবে বৈকি সোনাচ্চাদ! এই নে' গেলুম বলে! এখন একটু থির হ'য়ে বোসো ত' মানিক! ব'লে, বাঙ্গা হারটা খুলে খেঁদির হাতে দিয়ে বলল,—নে, ধর। আদাআদি বাবা,—তার কমে পোষাবে না!

খেঁদি হারটা মুঠোজাত করে বলল···ঢং রাক! হামেশা যা হচ্চে, তাই পাবি,—বারো আনা, চার আনা—

বাঙ্গা ঘোরতর আপত্তি করে বলল, দোহাই তোর, মজুরী পোষাবে না! করতে কম্মাতে ঝককি পোয়াতে বাঙ্গারাম, আর পায়ে পা

রেখে লাভের কড়ি গোনবার ব্যালা তুই? আর এটাতে খাটনীও জবরদস্ত!

খেঁদি আর না ঘাঁটিয়ে বলল, আচ্চা, ছ'আনা নিস্। মড়া ছিনে-জোঁকেরো বাড়া—

এমন সময়, পিসী ঘরে না কি গো, ব'লে ঝাঁপ ঠেলে বছর সাতাশ-আটাশের একটি স্ত্রীলোক ঘরে ঢুকল। গায়ের বরণ তেল-চুকচুকে, কপালটা ঢিবি, হাতুড়ি-পেটা নাকটার তলা দিয়েই হারমনিয়মের চাবির মতো একসার দাঁত বেরিয়ে পড়েচে। চোয়ালটা কানের কাছে চৌকো হয়ে সামনের দিকে অনেকটা এগিয়ে এসেচে।

সে ঘরে ঢুকেই বলল, ওম্মা! কার ছেলে গো পিসী! দিব্যি—

খেঁদি জিব উল্‌টে বলল, আ মর, ঢং দেকে আর বাঁচিনে! ছেলে যারই হোক, তোর তা দিয়ে কি কাজ লা?

দাঁতী বলল, আহা চটিস্ কেনে পিসী! তোর যে নয় তা জানি, তবে উড়ে ত' আর আসেনি, তাই সুধোচ্চি।

ছুরৎ যাই হোক দাঁতী গুণের মেয়ে। বয়েসগুণে ভিক্ষে ছাড়াও তার রোজগার ছিল মোটা, খেঁদির তা অজানা ছিল না। সে একটু নরমসুরে বলল, বাঙ্গার রোজগেরে মাল।

দাঁতী সহজ সুরে বলল, বটে!

সে ছেলেটির পাশে গিয়ে বসল। তার খামখা ইচ্ছে হচ্ছিল ছেলেটির গায়ে মাথায় একটু হাত বুলিয়ে ছায়, একটু কোলে নিয়ে···ধ্যেৎ!

ছেলেটি আবার এমন একটি নতুন জীব দেখে ভড়কে গেছল, কিন্তু দাঁতী কাছে এসে বসতে সে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

দাঁতী একটু বিব্রত হয়ে অন্যদিকে তাকাল। তারপর বাঙ্গার দিকে ফিরে বলল,—তোর আবার ছেলে পুষবার সক্ গেল কবে থেকে রে?

বাঙ্গা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, ন্-নিকুচি করেচে তোর সকের! তা'হলে একনি নে'যাব পিসী? আমার কিন্তু আর তর সইচে না!

খেঁদি বলল, বোস্।

ছেলেটি এতক্ষণ দাঁতীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এইবার হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল। তার অব্যক্ত গোঙড়ানির ভেতর থেকে একটি কথা শুধু বোঝা গেল……মা!

দাঁতের দৌলতে দাঁতীর মুখে কোনো ভাবের ছাপ পড়লেও সহজে ধরা যেত না। অসাবধানে তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল,—আহা! কিন্তু পরক্ষণেই সে সামলে নিয়ে বলল, আ-মর!

খেঁদি তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে গলাটা যথাসাধ্য মোলায়েম করে বলল, যা না লো মাগী, সঙের মতো হেতা বোসে আহা উহু সুরু করলি কেনে? ঘর যা! কোতা দু'পয়সা উপায়ের পত দেখবি, না—

দাঁতী ঝাঁঝের সাথে বাধা দিয়ে বলল, আ মর্! আমার রোজগারের দুঃখে তোর তো ঘুম হচ্চে না! তোর যদি অসুবিধে হয় ত' বল, যাচ্চি। বলি আজকাল কি—

পিসী সত্যিই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, কপাল! কিন্তু তাও বলি, ড্যামাক দ্যাকাস্নি। বয়েস কালে তোর দুনো রোজগার করেচি আমরা।

দাঁতী হেসে বলল, পিসী দুঃখ করিসনি। একনো দু'এক পোঁচ লাগিয়ে পরিপাটি করে চুলটুল বাঁধলে—চাইকি,—

বাঙ্গা বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাশতে কাশতে বলল, ঘেন্নাঘাঁটী

করিস নি বিন্দি! যা তুই, আমাদের একটু কাজকম্মের কতাবাত্তা আচে।

বিন্দি-দাঁতীর শেষ দিকের কথাবার্তাগুলো পিসীর ভালোই ঠেকছিল, কিন্তু কাজকর্মের কথা কানে আসতেই সে গা-ঝাড়া দিয়ে বলল, যা। শোন, উল্টোডিঙ্গীর ছুঁড়িটা ওই কোনার পূবদোরি ঘরে বন্দ আচে, এই চাবিনে, রতনা এলে দিস।

একটা গোপন কিছুর আঁচ পাবার পর থেকে বিন্দির ওঠবার আর মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু জলে থেকে কুমীরের সাথে বাদ করা সম্বন্ধে ওই যে কি একটা প্রবাদ আছে, সেইটের কথা মনে করে তাকে উঠতে হ'ল। সে বলল, উঠচি। ছেলেটাকে নে' গেলাম পিসী, দরকার হলে নে' যাস।

বাঙ্গা হাঁ হাঁ করে উঠল, রাক্ রাক্, নাবিয়ে দে! মাগীর বলা নেই কওয়া নেই—

খেঁদি একটু অবাক হয়ে বিন্দির মুখের দিকে তাকাল! তারপর কি ভেবে বলল,—আচ্চা, নে'যা। কিন্তু ঢাক পিটেবেড়াস নে যেন! নিজের ঘর ছাড়া আর কোথাও বারও করিসনে!

বিন্দি বলল, আচ্চা। তারপর ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে ঝাঁপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ফিরে বলল, আচ্চা পিসী, ছেলেটাকে যদি পুষি? দিয়ে দিবি আমায়?

বাঙ্গা লাফ দিয়ে উঠতে যাচ্চিল, খেঁদি তাকে থামিয়ে দিয়ে ঠোঁটে একটু হাসি টেনে বলল, তা কি হয় লা মুকপুড়ি? হেতা ছেলে পুষবি কি? ও যার ছেলে তাদের দে' আসতে হবে, তু' দিয়ে যাস খানিক বাদে—

দাঁতী কিছু বুঝল কিনা সেই জানে, ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

বাঙ্গা কুঁদে উঠল, তোর আক্কেল খানা কি বল্ ত'? ওকে হাত-ছাড়া করলি যে বড়? একন, ককন দিয়ে যাবে তারি পিত্যেশে বসে থাকতে হবে।

খেঁদি তাড়া দিয়ে বলল, চুপ ক'রে বোস্। ও মুকপুড়ির সামনে তুই অমন কুঁদে কুঁদে উটচিলি কেনে বল ত'? আমি যা করি সে সবদিক ভেবেই করি। কিন্তু তোর চালচুল দেকে ত' ও টের পেয়ে গেচে যে, ভেতরে কিচু গলদ আচে!

বাঙ্গা একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, হ্যাঁ, বিন্দি টের পেলে ত' ভারী—

—ভারী নয়। কারুকে বিশ্বাস নেই, ওসব পিরিত-ফিরিতের ঠাঁই হেতা নয়। কত মিন্সে আসে ওর ঘরে, দু'কান হ'তে কতক্ষণ?

—তবে ত' যে বড়' ছ্যানাটাকে ছেড়ে দিলি?

—সে আমি ঠিকই করেচি। না দিলে ওর সন্দ হত, একুনি গে ঢাক পিটে বেড়াত। নে' গেচে, এখন ঠাণ্ডা থাকবে খানিক। তু' এর ভেতর যোগাড়-যন্তর সব ঠিক ক'রে রাক্, মাঝ রাতের আগে কিছু হবে না, রাত পোয়াবার আগেই খাল পার ক'রে দিয়ে আস্তে পারবি।

—যোগাড় ত' কচু! ওই তো জীব! গলায় আঙুল দিলেই—

—উঁহু। তাতে বিপদ আচে। আস্ত অতবড় লাসটা নে যেতে গেলেই ধরা পড়বি। কেটে-কুটে না নিলে···যন্তর-পাতি কিছু-নেই?

—আমায় সেই বড় বাঁক ছুরিখান—

—তাতেই হবে। ব'লে খেঁদি উঠল।

দরজার কাছে এসে বলল, বিড়ি আচে? দে একটা। একন যা,···হ্যাঁ, গোটা দুয়েকের সময়, যা।

অন্ধকারে প্যাচপেচে কাদার মধ্যে দিয়ে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বাঙ্গা শুনতে পেলে, ওধারে বিন্দির কুঁড়ের দোরে দাঁড়িয়ে দলেরই দু'জন মরদ মত্ত-কণ্ঠে হল্লা জুড়ে দিয়েচে, বি···ন্দি···দ-দোরটা খোল মাইরি··· ! র···রাত যে পুইয়ে গেল ব···আওয়া······ !

বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে বিন্দি তাড়া দিয়ে উঠল, সরে পড় ভালো চাস ত' ! মর, মর ! নইলে ঝেটিয়ে রস ঝেড়ে দোব !

বিন্দির ব্যবহারের রকমফের দেখে একটু অবাক হয়ে বাঙ্গা গান ধরল, গায়লা দিদিলো–

খেঁদির ঘরে ছেলেটাকে দেখা অবধি বিন্দির বুকের মধ্যে অত্যন্ত মরচে পড়া কোন্ একটা তারে কেবলি কাঁপন উঠছিল, তাতে তার নিজেরি থেকে থেকে অবাক লাগছিল।

পেটের ক্ষিদে, সারা গায়ে ক্ষিদে ক্ষিদে, এ সবের অনুভূতি তার অজানা ছিল না ; সে ক্ষিদের তৃপ্তির পথও জানা ছিল। কিন্তু বুকের ঠিক মাঝখানটাতে কিসের এ ক্ষিদে ! এ একদম নতুন ! ঘরে এসে ছেলেটাকে বুকে চেপে চুমোয় চুমোয় তার দু'গাল ভরিয়ে দিয়েও তার তৃপ্তি হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল আরো···আরো—কিন্তু আশ মিটছিল না।

ছেড়া কাঁথা, কম্বল, এঁদোগলির পচা পাঁক, অভাব ও অসুখের কাৎরানি, ক্ষিদে ও পশুলালসার হাহাকার, এরই ভেতর সে আজন্ম প্রতিপালিত। তাই মনের ওলোট-পালট মাঝে মাঝে তাকে অবাক করে দিচ্ছিল, কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে সব ভাববার মতো মনের অবস্থাও তার ছিল না, শক্তিও না। খালি মনে হচ্ছিল, জলের তোড়ে নদীর পাঁর

ধ্বসে পড়ার মতো মনের মধ্যে কিসের যেন ভাঙন সুরু হয়েছে···একটু ভালোই ঠেকছে তাতে—

বাইরে ভর সন্ধ্যের খ'দ্দেরের দল হাঁকাহাঁকি করে ফিরে গেল। কেউ কেউ এক কথায়, কেউ গাল খেয়ে। ছেলেটাকে বুকে চেপে ধ'রে সে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

ছেলেটা প্রথমে বিন্দির চেহারা দেখে তার কাছে আসতে ভয় পেয়েছিল, কিন্তু তারপর থেকে কি জানি কি-ভাবে ঠাণ্ডা হয়েছিল। এইবার বিন্দির কোলের ভিতর থেকে মুখ বার করে বলল, মা' কাচে যাব।

উঠে ব'সে, তাকে কোলে বসিয়ে বিন্দি বলল, যেয়ো। ওরা খুব মেরেছিল না? কৈ দেকি?

শিশু মাথায় হাত দিয়ে বলল, মেরেচে।

মাথায় চুমো খেয়ে হাত বুলোতে বুলোতে দাঁতী বলল, বাছা রে! খিদে পেয়েছে মানিক?

ছেলেটি ঘাড় কাৎ করে বলল, খাব। দুধ খাব না জিলিপী খাব।

—জিলিপী? আচ্চা! দিচ্চি এনে···কমলা নেবু খাবে?

আঙুল চুষতে চুষতে ছেলেটি বলল, হুঁ।

ঘরের কোনায় একটা কাগজের ঠোঙায় দু'টো লেবু ছিল। এনে ছেলেটির দু'হাতে দিয়ে বিন্দি বলল, খুলে দেব! দিই?

—হুঁ।

লেবুর খোসা ছাড়িয়ে দিতে দিতে বিন্দির দু'চোখ হঠাৎ জলে ভ'রে এল। একটু পরেই চোয়ালের উঁচু হাড়টা বেয়ে টস্‌টস্ ক'রে জলের ফোঁটা ছেলেটার হাতে এসে পড়ল।

ছেলেটা মাথা উঁচু ক'রে দেখে, লেবু ভক্ষণে ক্ষান্ত হয়ে বলল, ছি! কানে না—

একটা অস্ফুট আওয়াজ ক'রে মুখ ঢেকে বিন্দি হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠল।

ছেলেটি বিব্রত ভাবে তার দিকে তাকিয়ে কমলা লেবুতে মন দিল।

খানিকপরে চোখ মুছে বিন্দি উঠে বসল। তার মনে হ'ল একটু পরই ত' খোকাকে পিসীর ওখানে দিয়ে আসতে হবে। কি করবে ওরা ওকে নিয়ে! কিন্তু···পিসী যে বলেছিল যাদের ছেলে তাদের ফিরিয়ে দে' আসবে···সত্যি? মনেত' হয় না ··এত সহজে—

আস্তানার দস্তুর বিন্দীর অজানা ছিল না। ছেলেটাকে হয় বেচে দেবে, আর যদি রাখে তবে হাত-পা খোঁড়া করে দিয়ে তাকে রোজগেরে করে তুলবে।

খানিক ভেবে চিন্তে সে বলল, তোমার বাড়ি কোতা লক্ষীটি—

সে বলল, বাড়ি যাব।

—যাবে বৈ কি। কি রকম বাড়ি? খুব বড়?

—এ—তো বড়। লাল বাড়ি—

—লাল রংঙের বাড়ি? টেরাম গাড়ি যায় সামনে দিয়ে?

ট্রামের নাম শুনে খোকা উৎফুল্ল হয়ে উঠল, টাম যায়, রেল যায়, আমি টামে চড়ব—

ট্রামও যায় রেলও যায় শুনে বিন্দির একটু খটকা লাগল। সে বলল, রেলে চড়বে না? রেল গাড়িতে?

খোকা বলল, ধ্যেৎ···তাতে বুঝি চড়া যায়। মাটি, কাদা, ময়লা থাকে—

বিন্দির মনে রাস্তাটার আঁচ আসতে লাগল। সে জানত বাঞ্ছা বেশীর ভাগ সময়ই শেয়ালদার দিকে ঘোরে। সে মনে মনে একটা মতলব এঁচে বলল, খোকন মনি, তুমি বোসো একটু, আমি জিলিপী কিনে ফিরে আসি কেমন? কেঁদোনা?

জিলিপীর নামে খোকন মাথা নেড়ে বলল, জিলিপী খাব। কানব না।

—আচ্ছা। বিন্দি বেরিয়ে ঝাঁপ এঁটে দিয়ে আস্তানা থেকে বেরিয়ে পড়ল।

জিলিপী নিয়ে ফিরে আসতে আসতে তার মনে হতে লাগল, কি করা যায়। ওরা যাই করুক, খোকার অনিষ্টই করবে। নিজের কাছে ওকে রাখবার জন্যে তার সমস্ত মন উতলা হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তাহ'লে ত' খেঁদির হাত এড়ানো যাবে না। তবে—

খোকার কথায় যদ্দূর বোঝা গেল, তাদের বাড়ি সারকুলার রোডে। কিন্তু কোন্খানটায় ঠিক বোঝা গেল না। না যাক্, ছেলে হারিয়েছে, তারাও কিছু নিশ্চিন্ত হয়ে বসে নেই, এতক্ষণ সোরগোল পড়ে গেছে। খোঁজ করলেই সন্ধান পাওয়া যাবে।

আস্তানায় ঢুকে মনে হ'ল, এধার ওধার ঘুরে দেখে আসা ভালো, যদি কেউ থাকে।

রাত হয়ে গেছে। সমর্থ যারা, তারা রাতের রোজগারে বেরিয়েছে। খেঁদির ঘরে সব চুপচাপ···মাগী বোধহয় ঘুমুচ্চে। এ-ঘর সে-ঘর থেকে মাঝে মাঝে দু'একটা ঘুমন্ত গোঙানি, ও ছোট খাট ফিস্ ফাস শোনা যাচ্চে।

আড্ডা প্রান্তের পুব-দুয়ারী ঘরটা থেকে রতনার মত্তজড়িত তর্জন ও স্ত্রী কণ্ঠের অস্পষ্ট ফোঁপানি ছাড়া আর বড় কিছু কানে আসছে না।

সন্ধ্যের আগে ক্ষান্তর ঘরের খুন-খুনে হাবাটা পটল তুলেছিল। লাসটা ঘরের সামনে পাঁকের মধ্যে টেনে ফেলে দেয়া হয়েচে, সময় বুঝে কাল যা হয় করা যাবে।

দেখে শুনে বিন্দি নিজের ঘরে ফিরছিল, হঠাৎ মানুষের গলার আওয়াজে আঁৎকে উঠল।

—মাইরি, কে বাবা আঁদারে ঘুট্‌ঘুট্ করে বেড়াচ্চ? কে, বিন্দি?

—ওঃ! মড়া তুই!

নিজের ঘরের দাওয়ায় ব'সে বাঙ্গারাম আ-প্রাণ চেষ্টায় লম্বা কলেকটাতে দম কসছিল, বিন্দিকে দেখে বলল, আয়, আয়—

বিন্দি বলল, একন না, কাজ আচে।

—রাতদুকুরে কি কাজ বাবা! আজ কদ্দিন মাইরি—

—সে কি রে ড্যাকরা, এই না পরশুই—

—সত্যি ভুল হয়ে গেচে মাইরি! তা আজকে···বলে বাঙ্গা একটা ইঙ্গিত করল।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে বিন্দি বলল, এয়ার্কি রাক, নইলে—

—কি বাবা! ধম্মোভাব কদ্দিন থেকে?

—যদ্দিন থেকেই হোক, তোর তা দিয়ে কাজ! বিন্দি ঘরের দিকে চলল।

বাঙ্গা পেছন থেকে হাঁক দিল, বিন্দি, ছোড়াটা কোতা র‍্যা?

—পিসীর ঘরে। ঘুমুচ্চে।

—দু'টোর ঘন্টি শুনেচিস গীর্জের ঘড়িতে?

—খানিক আগে বারোটা বাজল।

—ওঃ তবে একনো বহুৎ টাইম আচে।

কলেকটা উপুড় করে রেখে, বাঞ্ছারাম সেইখানেই হাতে মাথা রেখে কাৎ হয়ে পড়ল।

ঘণ্টাখানেক পর, খেঁদি আর বাঞ্ছা এসে বিন্দির ঘরের সামনে দাঁড়াল। খেঁদি কর্কশ চাপা গলায় ডাকল, বিন্দি···ওলো দাঁতী! মর মাগী···ঘুমোলি নাকি ?

—নিশ্চয় আয়েস করে ছোঁড়াটাকে নিয়ে গড়ানো হচ্চে। ঢং দেখে আর বাঁচিনে! যত অনাছিষ্টি—

বাঞ্ছা ঝাঁপে ধাককা দিয়ে হুমকে উঠল, ওঠ শালী!

ধাককার চোটে ঝাঁপটা খুলে গেল।

খেঁদি বলল, যা ত' বাঞ্ছা, নে' আয় মাগীর চুলের মুটি ধ'রে।

আঁধার ঘরে ঢুকে, হাৎড়ে হাৎড়ে খানিক ঘুরে বাঞ্ছা বলল, ঘর খালি পিসী, কেউ নেই!

—অ্যাঁ, সে কি রে! ব'লে খেঁদিও গিয়ে ঘরে উঠল।

সত্যি ঘর খালি। জিনিষ পত্তর যা ছিল ঠিক আছে। মানুষটি নেই।

বাঞ্ছা রুদ্ধকণ্ঠে বলল, গেল কোতা তাহ'লে! এই'ত খানিক আগে দেখনু কোত্থেকে এসে ঘরে ঢুকল। ডাকনু, বললে কাজ আচে। ছোঁড়াটার কথা সুধোতে বললে, তোর কাচে, ঘুমুচ্চে!

—কি বললে ? আমার কাচে!

—হ্যাঁ।

—সেই যে নে' এল, তা'পর ত' আমার ছায়াও মাড়ায়নি মাগী। যত নষ্টামি! নিশ্চয় ভেগেচে ওকে নে'—

—ভাগবে কোতা? আর ক্যানই বা ভাগবে? ছোঁড়াটার গায়ে ত' আর কিছু ছেল না!

—তা না থাক! মাগীর রকম-সকম একটুও ভালো ঠেকচে না না আমার! কি ফ্যাসাদেই যে পড়নু—

—ফ্যাসাদ, না কচু! কিন্তু, ছোঁড়াটা নেহাৎই যে বাচ্চা! পিরিত-ফিরিতের—

—গাঁজার দমটা চড়েচে বুঝি? যা তা বকিসনি, একন কি করবি, তাই ছ্যাক!

—করা আবার কি! এ তল্লাটে যদি খোঁজ মেলে ত' দেকে আসি!

—ছ্যাক, আমার কিন্তু বাপু রকম-সকম সুবিধের ঠেকচে না!

—তকুনি বলেছিনু তোকে, তা তুই ত' আমার কতা শুনবিনে! তখন না ছেড়ে দিলেই হতো!

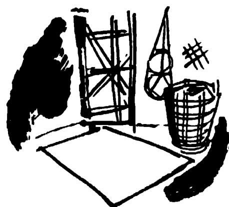
পরদিন দুপুরে বাঞ্ছা এসে খবর দিল, শুনেচিস পিসী কাণ্ডটা! দাঁতী মাগী ছোঁড়াটাকে নে' ফেরৎ দিতে গেচল তাদের বাড়িতে, তারা তাকে পুলিসে দিয়েচে—

খেঁদি কপালে চোখ তুলে বলল, উপায়! এইবারে ত' দলশুদ্ধ ফাঁসাবে—

বাঞ্ছা একগাল হেসে বলল, কচু! তু' ঘাবড়াসনি পিসী, মাগী বোকার হদ্দ। আমি খবর নে' এনু, ও দলের কতা কিছুই ফাঁস করেনি। বলেচে ছোঁড়াটাকে পতে কানতে দেকে ও কোলে নে' বাড়ি পৌঁচে

দিতে গেচল! তারা তা মানবে কেন? ওদের বাড়ির ঝিটা বললে, হার চুরির জন্যে মাগীর জেল হবে!

কথাটা শেষ ক'রে আর একবার হুল্লোড় করে বাঞ্ছারাম হেসে উঠল।





খেঁদি-পিসীর পটলডাঙার দল যখন পথে ভিক্ষে করতে বেরুতো, তখন দলে একটিও পুরুষ থাকতো না বটে, কিন্তু তাদের আস্তানার অন্ধকূপ-গুলির বাসিন্দা শুধু ওই মেয়ে কটিই ছিল না। দু'একজনের ঘর ছাড়া প্রায় প্রত্যেকের ঘরেই দুটি-একটি ক'রে পুরুষ থাকতো। পথে বেরুনো ছাড়াও তাদের অন্য রোজগার ছিল। রাত-বিরেতে পকেটকাটা অথবা ছোট খাটো চুরিচামারি করা, অবশ্য এসব আয়ের কথা প্রায়ই দলে ফাঁস হতো না। মোড়ল তাদের খেঁদি।

চঞ্চু থাকতো ক্ষ্যান্তর ঘরে। বিশেষ যে কোন সম্পর্ক ছিল, তা নয়। বছর চারেক আগে সে ক্ষ্যান্তর ভাই-পো পরিচয় দিয়ে এসে দলে ভর্তি হয়। ক্ষ্যান্ত, খেঁদির ডানহাত কাজেই খেঁদির বিশেষ ইচ্ছে না থাকলেও ক্ষ্যান্তর অনুরোধ ঠেলতে না পেরে তাকে নিয়ে নেয়।

পটলডাঙার পুরুষগুলো নাম করা। ও-তল্লাটে অমন বদমাইস, হৃদয়হীন জানোয়ার আর কোনো দলেই ছিল না। দলের সেরা লোক ওই চঞ্চু। সে না পারতো এমন কাজই নেই। তার এই গুণের জন্যেই খেঁদি তার ওপর খুশি ছিল। তা না হলে এতদিন তাকে পথ দেখতে হতো।

একবার সে বাইরে রাত কাটাতে গিয়ে ভিন-দলের এক মেয়ের কান কেটে নিয়ে এসেছিলো। মেয়েটা নাকি তার কি এক প্রস্তাবে

আপত্তি করেছিলো, তাই। আর একবার পথে একটা ছোট ছেলের গলার হার ছিনিয়ে নিতে গিয়ে সে তার চোখ দুটো আঙুলে টিপে গেলে দিয়েছিলো। পটলা স্বচক্ষে দেখে এসে খবর দেয়।

এহেন চঞ্চু যখন একদিন ময়লা, রোগা ও বোবা এক ছুঁড়িকে নিয়ে এসে দলে ভর্তি ক'রে নেবার সুপারিস করতে লাগলো, তখন সবাই অবাক হয়ে গেল। ছুঁড়ি দেখতেও এমন কিছু নয়, আর তার সাথে চঞ্চুর ভাবের কথাও আগে কিছু জানা যায়নি। কোথায় যে তার দরদ ঠাহর করতে না পেরে সবাই অস্থির হয়ে উঠলো।

ছুঁড়ি তো ভর্তি হয়ে গেল। রোজ সবায়ের সাথে পথে বেরোয়। ক্ষ্যান্তর ঘরখানা ছিলো বড়, সেই ঘরে সে থাকে, চঞ্চু তার খবরদারী করে। অন্য কোনো পুরুষের সাথে মিশতে দেয় না। সে নিজেও কাজে বেরুনো অনেক কমিয়ে দিলে।

হরিমতীর ঘরের রতন একদিন তাকে বললো, কোত্থেকে এক বেটীকে জুটিয়েচিস চঞ্চু, তুই যে ব'য়ে গেলি!

চঞ্চু তার কথায় কান না দিয়ে বললো, জ্বালাস্ নে রতনা, নিজের কাজ দেকগে যা!

—বাবাঃ, এযে কেউটে সাপ! ফোঁস ক'রে তো এলি, আসল ব্যাপারটা কি বল্ দিকি! বলি, বাঁধিয়ে বসেচিস কিছু? কিন্তু তুই তো সে পাত্তর নোস! অমন কত বাঁধিয়েচিস্, কিন্তু নিজে তো কখনো এমন বেঁধে পরিসনি!

চঞ্চু তাকে ধমক দিয়ে বললো, চুপ্ রে' হতভাগা! আমি যা করি, না করি—তোর তাতে কি'রে? ফের যদি যা-তা বলবি অমন, তবে,—জানিস তো চঞ্চুকে—

রতন বিলক্ষণই জানতো, আর তাই না ঘাঁটিয়ে স'রে পড়লো।

সে স'রে পড়লো বটে, কিন্তু ব্যাপারটা এইখানেই চাপা পড়লো না। চঞ্চুর আর আগের মতো ফূর্তি নেই। পথে বেরুনো তো ছেড়েচেই, রাতবিরেতে রোজগারও আর করতে চায় না। দিন-রাত ঘরে বসে ব'সে থাকে। ছুঁড়ি ফিরে এলে তাকে নিয়ে বেরিয়ে যায়, রাত বারটা-একটায় ফেরে।

এসব খেঁদির চোখ এড়ায়নি। সে মুখ বুঁজেই ছিলো। একদিন ব্যাপারটা এতদূর গড়াল যে, আর চুপ করে থাকা চললো না।

সন্ধ্যেবেলা পটলা এসে বললে যে, সে রোজগারের মৎলবে ঘুরছিল। একটা মেয়ের হাতের বালার ওপর তার নজর ছিলো। বালাটা ছিনিয়ে নিতে গিয়ে সে তার একটা আঙ্গুল মুচড়ে ভেঙে দেয়। চঞ্চু কোত্থেকে দেখতে পেয়ে এসে তাকে ঠাস্ ঠাস্ ক'রে দুটো চড় বসিয়ে দিয়েচে।

খবর শুনে দলের স্ত্রী-পুরুষ সবাই খাপ্পা হয়ে উঠলো। সকলে মিলে খেঁদিকে ধরে পড়লো, এর একটা বিহিত কিন্তু তোকে আজই ক'রতে হবে পিসী। নইলে সব যে যেতে বসেচে। ড্যাকরার যে কি হ'য়েচে ক'দিন থেকে—সাধুগিরি ফলাতে সুরু করেচে।

খেঁদি কারো থেকে কম চটেনি। চঞ্চু ফেরা মাত্র সবাই তাকে নিয়ে পড়লো।

—বল্ মুকপোড়া, তুই ভেবেছিস্ কি? দলের নাম ডোবাতে বসেচিস যে।

চঞ্চু কোনো জবাব দিলো না।

একজন বললো, আগে ও তো আর এমোন ছেল না। 'ওই

শুঁট্‌কি মাগী এসেই তো ওকে বিগড়েচে! ওকে না তাড়ালে চঞ্চুকে ফেরাতে পারবি না—

খেঁদি বললো, সত্যি ক'রে বল তুই, ও-মাগী তোর কে? আমি কেন, দশজনে দেকচে, ও-ই তোকে সারচে! ও কে তোর?

চঞ্চু মুখ তুলে দেখলো, সেও এসেচে। তার দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট ক'রে বললো, ও, আমার বোন!

দলের মধ্যে দু'জনা পট্‌পট্‌ মরে গেলেও কেউ অত আশ্চর্য হ'তো না। বোন? খেঁদির দলে বোন? মা-বোনের ছোঁয়াচ ঢের দিনই এড়িয়ে আসা গেছে!

খেঁদি বললো, কোতা পেলি তুই ওকে?

চঞ্চু বললো, রোজগারের মতলবে শেয়ালদা গেছনু। এক কোনায় ও হাত পেতে দাঁড়িয়েছেল। এক ভদ্দর নোক ওর হাতে একটা পয়সা দিয়ে গেল। তাই দেকে বেলেঘাটার মান্‌কে এসে সেটা তুলে নিয়ে ছুট মারতে যেতেই ধাক্কা খেয়ে ও পড়ে গেল। কি তাজ্জব হলুম দেকে যে, একবারও কাৎরালো না। এগিয়ে এনু—দেকি যে দু' চোক দিয়ে জল পড়চে—কিন্তু মুকে রা'টি নেই। সন্দ হ'লো, বোবা নাকি? শেষে দেখনু তাই। সাথে ক'রে নে' ভিড় কেটে বেরিয়ে এনু। তা-ও কি আসে? চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝনু—আমায় বিশ্বাস করচে না। বলনু আমায় সন্দ ক'রো না, আমি তোমার ভাই! ও খানিক ভেবে আমার সাথে চলে এলো। তা'পর এনে দলে ঢুকিয়ে দিইচি।

—কিন্তু তুই দিনকেদিন অমন ম্যাদামারা হ'য়ে যাচ্চিস্‌ ক্যানে—রোজগেরে বেরোসনা যে আজকাল?

—ভালো লাগে না।

রতন তাড়ি খেয়ে এসেছিল। হাতে তখনো গাঁজার কল্কে। একধার থেকে টেনে যাচ্ছিল। চঞ্চুর জবাব শুনে কল্কে নামিয়ে বললে, কি বাবা সোনার চান্, ভালো লাগে না? বাবা, পিরিত বাঁধিয়েছ, সে কথা বললেই হয়?—আচ্চা সত্যি ক'রে বল্ দিকি, কি রস তুই পেলি ওর মধ্যে—

রতনের মুখের কথা মুখেই রইলো। চঞ্চু তড়াক ক'রে এক লাফ দিয়ে তার ঘাড়ের ওপর প'ড়ে দোহাত্তা কীল-চড় মেরে যেতে লাগলো।

—মুখ সামলে কথা কইতে জানিসনি শুয়ার—বলবি আর—বলবি—বলবি—

সবাই হাঁ-হাঁ করে ছুটে এসে ছাড়িয়ে দিল। কিন্তু রতনের আর বসবার অবস্থা ছিলো না। ভুঁয়ে প'ড়ে গড়াতে লাগলো।

খেঁদি অবাক হয়ে দেখছিলো। তারই চোখের ওপর চঞ্চুর যে এতটা সাহস হবে, তা' সে ভাবে নি। হোক না চঞ্চু দলের মধ্যে সবচেয়ে তুখোড় সবচেয়ে নামজাদা। তা' বলে মোড়ল তো সে-ই।

খেঁদি বললো, শোন্ চঞ্চু, এই তোকে বলচি, ও মাগীকে তোর ছাড়তে হবে। যেখান থেকে ওকে কুড়িয়ে পেয়েচিস কাল গে' সেইখানে রেখে আসবি, নইলে—

চঞ্চু খেঁদির দিকে তাকালো।

—নইলে তোকেও দল ছাড়তে হবে। আগেকার মতো যদি হতে পারিস্, তবে ঢুকতে পাবি, নইলে আর নয়। বুঝেচিস?

চঞ্চু চুপ করে শুনলো। হাঁ-না কিছুই বললো না। খানিক পরে বোবা মেয়েটার হাত ধরে উঠে ঘরের দিকে চলে গেল।

যে যার নিজের গর্তে ঢুকে পড়ল।

ভোর রাতের আবছা আলোয় দু'টি লোক খেঁদির আস্তানা থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়লো।

সকাল বেলা চঞ্চু আর সেই ছুঁড়িটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না! সেদিন গেল, তার পরদিন,—তারপর অমন কতদিন চলে গেল, কিন্তু তাদের কোন হদিস্ আর মিললো না।

রতন টিপ্পনী কাটলো, বলেছিনু কিনা। শক্ত একটা কিছু বেঁধেচে বাবা। নইলে চঞ্চুর মতো স্যায়না ঘাগী—





শীতের শেষরাত।

বড় রাস্তার ওপর মস্ত তেতলা বাড়ি। অনেক জায়গা-জমি চারিধারে, প্রকাণ্ড ফটক। লতাপাতার ঝোপঝাড়ে দেয়াল ঢাকা।

বাড়ির বেশির ভাগটাই অন্ধকার। বারান্দায় দু'একটা আলো জ্বলচে। তেতলার একটা জানলা থেকে খানিকটা আলো বেরিয়ে এসে জমাট কুয়াসার জালে আটকা পড়ে থেমে গেচে।

ওপরের বারান্দা দিয়ে বার দুই একটা নার্স হেঁটে গেল। মাঝে মাঝে রোগাতুর কণ্ঠের দু'একটা কাৎরানি আর মেথর জমাদারের ফিস্-ফাস ছাড়া কোন সাড়াশব্দ নেই।

রাস্তা নির্জন, নিস্তব্ধ। দূরের একটা বাড়ি হতে থেকে থেকে ঘুমন্ত ছোট ছেলের কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্চে।

বড় বাড়িটার পাশেই ছোট্ট একটা গলি। গলির মুখটা বড় রাস্তার গ্যাস বাতির আলোয় আলোকিত, ভেতরটা বেজায় অন্ধকার। তেতলা বাড়িটার জঙলা দেওয়ালের মধ্যে ছোট্ট একটা দরজা গলির ওপর। লতাপাতাগুলো এমন ঝুলে পড়েচে যে চট্ ক'রে নজরে পড়ে না। দরজা খুলে আপাদমস্তক কালো চাদরে মুড়িদেয়া আয়াশ্রেণীর একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এল। সন্তর্পণে এদিক ওদিক চেয়ে ডাকল, ঝুমন—

অন্ধকার গলির সবচেয়ে আঁধার কোন্ থেকে সাড়া এল, কে, সুখিয়া—

সাড়া পেয়ে সুখিয়া রাস্তায় নামল।

দু'জনে মিলে গলির ভেতরে খানিকটা এগিয়ে গেল।

সুখিয়া বলল, তোর আসতে এত দেরি হ'ল যে আজ? আমি দু'বার এসে ঘুরে গেচি আগে।

ঝুমন একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল, পথে এক শালা পুলিশের পাল্লায় পড়ে গেছনু! শালা কি সহজে ছাড়ে? অনেক ভজিয়ে-টজিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে আসতে দেরি হয়ে গেল। —বাপ! যা শীত পড়েচে আজ!

ছেঁড়া কাঁথাখানা দিয়ে বেশ ক'রে কান মাথা ঢেকে নিয়ে বলল, নে' মাল বার কর।

সুখিয়া চাদরের ভেতর থেকে একটা কাপড়ের পুঁটলি বার করল। ঝুমন হাত পেতে ধরতেই সেটা নড়ে উঠল। ভেতর থেকে একটা অস্ফুট শব্দ হ'ল, ওঞা-ওঞা—

ঝুমন সতর্কভাবে চারদিকে তাকিয়ে বলল, কদ্দিনের?

—একটা দিন ষোল, আর একটা এক মাস।

—মেয়ে, না ছেলে?

—দু'টোই মেয়ে।

ঝুমনের বীভৎস কুৎসিত মুখখানা সেই অন্ধকারের মধ্যে সুখের হাসিতে ভ'রে উঠল।

সুখিয়া বলল, দু'খানা লোটের কমে এ জোড়া ছাড়চিনে!

—থাম মাগী! দু'খানা লোট! আমার ছ-ছ'টা করকরে টাকা

লোকসান! এ জোড়ায় বারোখানা টাকা পাবি—মাদি ব'লে বলচি, মদ্দা হলে অদ্দেক দিয়েও পুছতুম না।

—মরে গেল, সে কি আমার কসুর? কুড়িদিনের অতবড় ছ্যানা, তু' বাঁচাতে পারলি নে, তা আমি কি করব? এর আগে ত' কখনো মরেনি আর! সেগুলোতে কত রোজগার করেচিস ভাব দিকি?—না, না, এ জোড়া নিতে হ'লে বিশ রুপেয়া ফ্যাল, তা'পর নে যা!

একটা শেষটান দিয়ে বিড়িটা ফেলে দিয়ে ঝুমন বলল, বিশ রুপেয়া কিছুতেই পারব না। আচ্ছা, বারোতে না ছাড়িস, সাত সাত চোদ্দ—

ব'লে সে গ্যাঁজে হাত দিল।

সুখিয়া অসন্তুষ্ট ভাবে বলল, তাহ'লে পনেরটা দে। সিসটারকে আবার পাঁচ টাকা দিতে হবে এর থেকে, আমার থাকল ছাই!

—জবরদস্তি ক'রে একটা টাকা বেশী নিবি?—নে! কিন্তু আগাম হপ্তায় ভাল মাল চাই—মেয়ে। ছোঁড়া অনেকগুলো হয়ে গেচে, ও আর চাইনে। মেয়ে দিবি। আর বেশ পুরুষ্টু হয় যেন।

—খালি মেয়ে হ'লে আগাম হপ্তায় হবে না—পরের হপ্তায়।

—আচ্ছা, আচ্ছা তাই। কিন্তু মদ্দা বাচ্চা আর চাইনে।

—সে মেয়েগুলো পার করেচিস?

—কোন্‌গুলো? ওঃ—হ্যাঁ। কুসমি নিয়েচে। বেটি চিপ্পুসের হাড়। বরাবর ওকে তাজা মাল জোগাচ্চি, কিন্তু বেটি শকুনী! এই ত' সেদিন পটলীকে পার করলুম, ন' বছরের অমন ডবকা মেয়ে'—বেটি দিতে চায় কিনা চল্লিশ টাকা। বললুম, মাসী, পথ দ্যাক্। ওকে ক্ষ্যান্তর কাছে ছাড়ব, ষাট টাকায় লুপে নেবে। অনেক ধস্তাধস্তির পর বায়ান্ন টাকায় রফা হ'ল।

—এত পাস, আর আমাদের সাতেই যত ছোট মান্‌সী?

ছোট মান্‌ষী! তোদের বেশি দাম দোব কোন্ সাহসে? যদি ম'রে যায়? আর আমার ত' নে গিয়ে পুষবার খরচ আচে! পাঁচ ছ'দিনের ছা' নিয়ে গে' ন'দশ বছরেরটি করতে হ'লে খাওয়াতে পরাতে কি কম খরচটা হয়? তার ওপর সব ক'টা কিছু দেখতে ভালো হয় না। খারাপ হলে দামও কমে যায়। কতকগুলোকে আবার ঘরে বসিয়েই হিল্লে করতে হয়। এসব খরচ পুইয়ে শেষ-মেষ আমার ত' থাকে কচু! আর ছোঁড়াগুলো ত' বাজে খরচ! খাইয়ে-দাইয়ে মানুষ করি—চোক ফুটলেই নিজের পত ঢ্যাকে—

—তার মানে? গোড়ায়ই খাম করে দিস্‌না সেগুলোকে?

—সবগুলোকে নয়। যেগুলো দিই, তাদের কাচ থেকে অবিশ্যি কিছু আদায় হয়। সেই লালচুলো বাচ্চাটার কতা মনে আছে তোর? সেটাকে হাত মুচড়ে কোমরের সাতে বেধে দিইছিনু। দিব্যি নুলো হয়ে গেচে এখন, পতে বসে, রোজগারও মন্দ হয় না।

—সে সায়েবের ছা'টার কি করেচিস?

—সেটার জিব কেটে দিইছিনু—কি জানি ব্যাটাচ্ছেলে বড় হয়ে যদি সায়েবি বুলি ঝাড়তে সুরু করে! এখন সেটা খুব রোজগেরে হয়েচে, তবে আমায় বড় একটা মানতে চায় না।

—তা হাতের পাঁচটা আঙুল কি সমান হয়? সবাই যে তোর বশ হবে এমন ধরা-বাঁধা কতা কিছু নেই!

কথা বলতে বলতে দু'জনে ছোট দরজার কাছে এগিয়ে এল।

সুখিয়া বলল, বিড়ি দে একটা—

—এই ধর। ঝুমন সুখিয়ার হাতে বিড়িটা দিয়ে শিশু দু'টিকে বেশ ক'রে ছেঁড়া কাঁথায় ঢেকে নিল।

একখানা ফিটন এসে থামল গলির মুখে। আরোহী দু'টি ফিরিঙ্গী যুবক। একজন চিৎ হয়ে প'ড়ে মত্তকণ্ঠে দুর্বোধ্য ভাষায় কি একটা ইংরেজী গানের সুর ভাঁজছিল।

ফিটন দেখেই সুখিয়া দরজা দিয়ে না ঢুকে অন্ধকারে এসে দাঁড়াল।

ঝুমন বলল, গেলি না যে বড় ?

সুখিয়া তার মুখে হাত দিয়ে বলল, চুপ্।

ঝুলেপড়া লতাপাতাগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে একজন নার্স এসে গলিতে নামল। দু'একবার শঙ্কিত চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে সে হন্ হন্ করে গাড়ির দিকে চলল।

ঝুমন কি বলতে যাচ্ছিল, সুখিয়া তার হাত টিপল।

নার্স গাড়ির পা-দানে পা দিতেই একজন যুবক তাকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিল।

মাতালটা গাড়োয়ানকে বলল, এই-য়ো—চালাও।

রাতের স্তব্ধতা ভেদ করে দু'একটা চুম্বনের আওয়াজ ভেসে এল।

গাড়ি চলে গেল।

সুখিয়া বলল, সিস্টারকে নিয়ে দিনকতক দেদার মজা লুটচে ছোঁড়া দু'টো।

ঝুমন জবাব দিল না। কাঁথাখানা আর একবার ভালো ক'রে জড়িয়ে সে বলল, আজ চললুম সুখিয়া—

—আয়।

গলি থেকে বেরিয়ে ঝুমন বড় রাস্তা ধ'রে কিছুদূর চলল। সামনে একটা কনষ্টেবল দেখে সে পাশে একটা গলিতে ঢুকে পড়ল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক এ-গলি সে গলি ক'রে সে শহরের এক প্রান্তে

এসে উপস্থিত হ'ল। সেখান দিয়ে একটা খাল চলে গেচে। সে সন্তর্পণে খালটা পার হয়ে, আরো কিছুদূর গিয়ে বা-হাতি একটা সরু জমির ফালির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ঘোর অন্ধকার। দু'ধার দিয়ে ছোট্ট ছোট্ট মেটে কুঁড়ে। দুর্গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে। শীতকালেও সে জায়গাটা কাদায় প্যাচ প্যাচ করচে।

খানিকটা গিয়ে মোড় ঘুরতেই, সে দেখল, একজন ভদ্রগোছের মানুষ র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে চোরের মতো চলেছে।

সে দাঁড়াল, ডাকল, কি চান বাবু হেতায় ?

ভদ্রলোক সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে আমতা আমতা করতে লাগল।

সামনের কুঁড়ের ঝাঁপ খুলে একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এল। বলল, কে ও ? সর্দার ! যেতে দাও, বাবু ময়নার কাছে এয়েছিলো !

—বিড়ি আচে ঘরে ? দেত' একটা, ব'লে সে দুয়োরে পা দিতেই স্ত্রীলোকটি বলল, ঘরে ঢুকো না সর্দার, মানুষ আচে।

ঝুমন অবাক হয়ে তার দিকে তাকাতে স্ত্রীলোকটি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে একটু হাসল। বলল, ভুঁদির ঘরে।

ঝুমন বিস্মিত কণ্ঠে বলল, আস্তানার মধ্যে হঠাৎ এত বাবুর আমদানী করলি কোত্থেকে খেঁদি ?

খেঁদি বলল, বাবুর আবার অভাব ! ঘণ্টা দু'তিন আগে ওই হোতা বড় রাস্তার মোড়ে বাবু দু'টি আস্তানার দিকে তাকিয়ে ঘোরা-ফেরা করছিল। ভুঁদি গিয়ে কতা কোয়ে নিয়ে এয়েচে।

—এটা যে পাড়া নয়, তা জানে ত' ?

—তা আর জানে না ! কত জিজ্ঞেসবাদ করলে। কে কে থাকে

হেতা, দিনের বেলা কি করে, এই সব। আমি বলি কি সর্দার, বাড়িউলি মাসীদের কাচে ছুঁড়িগুলো না বেচে, এখেনেই কেন ব্যবসা নাগিয়ে দাও না! আমি বলচি তোমায়, বাবুর অভাব হবে না।

—না, না, তু' পাগল হলি না কি? আর ছ্যাক, একটু সাবধানে কাজ করিস। এখন শোন্, ইদিকে আয়।

ঝুমন খেঁদিকে সাথে করে নিজের কুঁড়েয় নিয়ে গেল।

ঝাঁপ খুলে ভেতরে ঢুকে বলল, এই ছ্যাক, আজকের সওদা!

শিশু দু'টি দেখে খেঁদি বলল, কত নিলে?

—পনের।

—ঠকায়নি। বেঁচে বর্তে থাকলে চার কুড়ি টাকায় এক-একটা বিকোবে!

ঝুমন শিশু দু'টিকে ঢেকে ছেঁড়া মাদুরের ওপর শোয়াল।

তু' একটু খবরদারী করিস। আমি আসচি।—ব'লে সে বেরিয়ে পড়ল।

ভুঁদির ঘরে শব্দ শুনে তাকাতেই, সে দেখতে পেল, দিব্যি ফিটফাট এক যুবক কুঁড়ে থেকে বেরুল। সেদিকে আর না চেয়ে সে নিজের পথ ধরল।

চারিদিক একটু একটু ক'রে ফরসা হয়ে আসচে। ঝন্ ঝন্ শব্দ করতে করতে ময়লা-ফেলা এক্কাগুলো বড় রাস্তা দিয়ে চলতে সুরু করেচে।

পেছনের কুঁড়েটা থেকে ছোট্ট ছেলের কান্না শোনা যাচ্চে—ওঞা—ওঞা!



সারা বিকেল ঘর আর বার ক'রে, সন্ধ্যের মহড়ায় ফতিমা কুঁড়ের সামনের রাস্তাটায় এসে দাঁড়াল।

দুপুর বেলা জমিদারের প্যায়দা এসে বাকী খাজনার দায়ে স্বামী কালু সেখকে ধরে নিয়ে গেচে। ফতিমা জানত, খাজনার কোনও সুরাহাই হবে না। কোত্থেকে হবে? গেল বছর দারুণ খরায় ছোট্ট জমির ফালিটাতে একদানা শস্যও জন্মায় নি, এ বছর ত' দেশ-জোড়া আকাল, পেটে দেবার দু'মুঠোই জোটেনা—খাজনা ত' পরের কথা।

আজ তিন দিন দু'জনার ঠায় উপোসে কাটচে। খিদের দুশ্চিন্তায় আধমরা স্বামীকে তার যখন যমদূতের মতো পাইক এসে পাকড়াও করে নিয়ে গেল, ফলাফল সম্বন্ধে তখন থেকেই সে একরকম নিশ্চিন্ত হয়ে ছিল। তাই সারা বিকেল তার আর উদ্বেগের সীমা ছিল না।

রাস্তায় এসে বহুক্ষণ বসে থেকেও কালুর ফেরবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। আরো কিছুক্ষণ উৎকণ্ঠিতভাবে এদিক ওদিক চেয়ে হয়রাণ হয়ে ফতিমা ঘরে ঢুকে ছেঁড়া মাদুরটার ওপর উপড় হয়ে শুয়ে পড়ল। নির্বাক চোখের জলে তার দু'গাল ভেসে যাচ্ছিল।

বাইরে রাতের স্থির অন্ধকারের মধ্যে ঝিঁঝিঁর একঘেয়ে সারিগান

ছাপিয়ে শেয়ালের দল চেঁচাতে লাগল। মিনিট কয়েক তারস্বরে চেঁচিয়ে তারাও থেমে গেল।

হঠাৎ বাইরে পায়ের শব্দ শুনে সে চমকে উঠে ব'সে, চট্ ক'রে চোখ মুছে, দাওয়ায় এসে দাঁড়াল।

অন্ধকার। কিছুই চোখে পড়ে না। ফতিমা বলল, কে ?

কেউ জবাব দিল না।

ফতিমা আবার বলল, কে ?

এবারো জবাব না পেয়ে সে একটু অবাক হয়েই ঘরে ঢুকে কেরোসিনের ডিবেটা বার করে এনে জ্বালাল। আলোতে উঠোনটা ভালো করে দেখে সে আবার ঘরে ঢুকে ঝাঁপটা টেনে দিল।

কিসের না কিসের শব্দ,—একথা বেশিক্ষণ তার মনেও রইল না।

একলা ঘরে বসে তার মনে হতে লাগল : স্বামী এলে কি খেতে দেবে তাকে। ঘরে কিছুই নেই। তৈজসপত্রও এমন কিছু নেই, যা বাঁধা দিলে একটা পয়সা পাওয়া যায়। বন থেকে ভোর বেলা এক কোঁচড় বৈঁচি ফল তুলে এনেছিল ; তারই গোটাকয়েক অবশিষ্ট ছিল। ক্ষিদেয় তার নিজেরো সর্বাঙ্গ হিম হয়ে আসছিল। ভারী লোভ হচ্চিল দু'টো ফল মুখে দিয়ে চিবুতে—কিন্তু অভুক্ত স্বামীর কথা মনে পড়াতে হাত উঠল না। ঘরের কোনে মেটে কলসীতে জল ছিল, ঢক ঢক ক'রে তাই খানিকটা গলায় ঢেলে দিয়ে সে ঝাঁপ খুলে দাওয়ায় এসে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসল।

সেইখানে বসে তার মনে হতে লাগল স্বামীর কথা। সে দোষী, খাজনা দিতে সে পারেনি তাও ঠিক, কিন্তু খাজনা দেবার মতো অবস্থা যে তাদের নয়, একথাটা কেউ বোঝে না কেন। আজ বছর খানেক

প্রায় না খেয়ে, আধপেটা খেয়ে চলচে।• সে মেয়েমানুষ হয়ে এতটা বুঝচে আর মুলুকের রাজাবাবুর ঘটে কি ছাই এটুকু বুদ্ধিও নেই !

কতক্ষণ সে সেখানে বসেছিল ঠাহর নেই, চমক ভাঙল হঠাৎ খুব কাছেই পায়ের শব্দ শুনে। সচকিত হয়ে এদিক ওদিক তাকাতেই চোখে পড়ল দাওয়ার এক প্রান্তে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েচে। তার গা-টা একটু ছমছম করতে লাগল। সে বলল, কে দাঁড়িয়ে হোতা ?

যে দাঁড়িয়ে ছিল সে কোনো কথাই কইল না।

হঠাৎ পেছন থেকে আচমকা আর একজন এসে একহাতে তার মুখ আর একহাতে কোমর জড়িয়ে ধরল। এক লহমার জন্য সে অভিভূত হয়ে পড়ল, বাধা দেবার শক্তি রইল না।

আততায়ী তাকে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। যে লোকটা আঁধারে দাঁড়িয়েছিল, সেও সাত ধরল।

উনিশ বছরের জোয়ান মেয়ে ফতিমা, একটা মানুষের সাথে লড়বার তাগদ খুবই ছিল। কিন্তু দু'জনের মিলিত পশুশক্তির কাছে তার জোর কোনই কাজে এল না।

তিন দিনের অনাহারী, স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় অস্থিরচিত্ত, কাহিল মেয়েটির সমস্ত বাধা ও আপত্তি রক্তমাংসের ক্ষিদের আগুনের মুখে নেহাৎ খড়কুটোর মতো পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আধ ঘণ্টাখানেক পর যখন স-ইয়ার জমিদার-পুত্র চলে গেলেন, ফতিমা হুঁস হারিয়েচে তখন।

দিকব্যাপী নিবিড় নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে জ্ঞানহীনা ধর্ষিতা নারীর বুকটা সমান তালে কেঁপে যেতে লাগল।

কালু যখন ফিরল, অনেক রাত হয়ে গেচে তখন।

কম্পিত পদে দাওয়ায় উঠেই সে ডাকল, ফতি,—অ ফতি—

কেউ জবাব দিল না। ঘরে নেই ভেবে কালু একটু এগোতেই নজরে পড়ল ঝাঁপ খোলা। সে একটু অবাক হ'ল : ঘর খোলা—অথচ ফতি নেই…! হয়ত কাছেই কোথাও গেচে…পানিটানি আনতে, কিম্বা অমনি একটা কিছু। একবার মনে হ'ল পুকুর ধারটা ঘুরে আসে, কিন্তু কাছারী বাড়ীর আপ্যায়িতের তাড়নায় সমস্ত শরীর তখনো অবসন্ন, পা আর চলছিল না। যেখেনেই থাক, এখুনি আসবে ভেবে সে ঘরে ঢুকল।

দু'পা যেতেই পায়ে কি ঠেকে সে চমকে উঠল। ঝুঁকে প'ড়ে দেখতে গিয়ে ফতিমার হাতখানা হাতে বাধল। সে আস্তে আস্তে গায়ে মুখে হাত বুলিয়ে ঠাহর করে নিল মানুষটি কে। তারপর উদ্বিগ্ন হয়ে ডাকল, ফতি, ফতিমা—

ফতিমা সাড়া দিল না।

কালু মনে মনে শঙ্কিত হয়ে আঁধারে হাতড়ে হাতড়ে পথে কুড়িয়ে পাওয়া একটুকরো মোমবাতি খুঁজে বার করে জ্বালিয়ে ফেলল। তারপর তাড়াতাড়ি স্ত্রীর কাছে এসে বসতে যেতেই চোখ পড়ল দরজার কাছে কাগজের মতো কি একটা জিনিস। সে সেটা কুড়িয়ে এনে বাতির কাছে ধরল।

পাঁচটাকার নোট! কালু আকাশ পাতাল কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। নোটখানা সযত্নে কাপড়ের খুঁটে বেঁধে সে স্ত্রীর চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতে বসল।

কিছুক্ষণ বাদে ফতিমা চোখ খুলে বলল, কে…স্যাখ এলি?

হঠাৎ কি একটা মনে পড়তেই সে অস্ফুট শব্দ ক'রে সঙ্কুচিত হয়ে সরে বসল।

কালু ব্যগ্র কণ্ঠে বলল, ফতি কি হয়চে তোর? অমন করচিস ক্যানে? অসুক করেনি ত'?

জবাব না দিয়ে ফতিমা কালুর মুখের দিকে নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। একটা রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাসের মুক্তিতে তার শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠল। সে অস্পষ্টস্বরে বলল, তোর পায়ে ও কিসের দাগ? রক্তের না?—ব'লে সে স্বামীর কাছে এগিয়ে এল।

কালু দু'হাতে ফতিমাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরল। তার দু'চোখ দিয়ে টপ টপ ক'রে বড় বড় ফোঁটা কয়েক জল গড়িয়ে পড়ল।

ফতিমা তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, শুয়ে পড় তুই আমি বাতাস করে দিই। পানি দোব? এই দিচ্চি। আমার জন্যে মন বেজার করে থাকিস নে ত? কি হয়েচে আমার?

সে স্বামীর অজ্ঞাতে চোখ মুছে কলসী থেকে জল গড়িয়ে, ফল ক'টি এনে স্বামীর সামনে ধরল।

কালু টপাটপ ফল ক'টা মুখে ফেলে ঢক ঢক ক'রে খানিকটা জল গলায় ঢেলে দিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বলল, তুই? তুই খেলিনে কিছু?

ফতিমা ম্লান হেসে বলল, আমার খাওয়া হয়ে গেচে।

ছেঁড়া মাদুরটার ওপর গা ঢেলে দিয়ে জোড়াতালি দেয়া কাঁথাখানা গায়ে টেনে কালু বলল, কাল থেকে তোকে পেটের ভাবনা ভাবতে হবে না ফতি! কি পেয়েচি দ্যাক্—

সে খুঁট থেকে নোটখানা বার করল।

—কি করে এল খোদা জানে! কিন্তু এয়েচে যখন, তখন একে

হেনস্তা করলে খোদা খুসী হবে না। দু'টো জীব উপোসে মরচে দেখে তিনিই পাইয়ে দিয়েচেন হয়ত!

নোট দেখে ফতিমার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। এক লহমায় তার সন্ধ্যের কথা সব মনে পড়ে গেল। তার দু'চোখ ছাপিয়ে জল ছুটল—অনেক চেষ্টা করেও সে থামাতে পারল না।

কালু অবাক হয়ে ফতিমার মুখের দিকে তাকাল। এই দুর্দিনে টাকার আমদানীতে খুসীর বদলে চোখের জলের মানে সে মাথা খুঁড়েও বুঝে উঠতে পারল না।

—কাঁদতে লাগ্‌লি ক্যানে রে? হোলো কি?

ফতিমা দুই হাতে মুখ ঢেকে তার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

সব শুনে কালু রুখে উঠে দাঁড়াল। নোটখানা কুঁচকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে ঘরের কোন থেকে ধারালো দা'টা হাতে করতেই ফতিমা তার সামনে এসে দাঁড়াল।

—কোথা যাবি তুই এই রেতে?

—পথ ছাড় ফতি! দীনদুঃখীর মা-বাপ নেই যে মুলুকে, সেথা হাতের জোরই জোর! সেই বেজম্মার মুণ্ডুটা যদি না আজ ধড় থেকে খসাতে পারি ত'—

—যেতে হবে না তোর, শুয়ে পড়।

ফতিমার দীন কণ্ঠস্বর শুনে কালু ক্ষিপ্ত হয়ে বলল,···ক্যানে পথ আটকাচ্ছিস তুই? ওরে, উপোস ক'রে কালু সেখের কব্জির জোর এক রত্তিও কমেনি রে—সে এখনও দু'চারটা দুসমনের গর্দান নেবার তাগৎ রাখে—

—সে হোক, কিন্তু তাই ব'লে এত রেতে তুই যাবি সেই বাঘের

মুখে ? একা কি করবি ওদের অর্তগুল্বোর সাথে ? তার ওপর জমিদার বাড়ীতে গুলি বারুদের কারবার ? তার চেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে শুয়ে পড় এখন, কাল বিহানে যা খুসী করিস !

উত্তেজনার মুখে কালু অত কিছু ভেবে দেখেনি। তার ওপর নিজের যে শক্তিটুকু ছিল শরীরে, আজকের নির্যাতনে তা'ও কাবার হয়ে গেচে। সে অবসন্ন হয়ে আবার শুয়ে পড়ল। বলল, তুইও শুবি আয়।

—হেথায়ই শুচ্চি আমি, তুই ঘুমো।

—ওসব বুঝিনে আমি, শুনতেও চাইনে ! তুই কি একটুও খাটো হয়ে গেচিস আমার কাছে যে ওরকম করে বলবি ? তুই আয়—

—আমার মন যে মানচে না। আজকের রাতটা যেতে দে না হয়—

কালু আর কিছু বলল না। ক্লান্তি আর ঘুমে তার চোখ ভেঙে আসছিল।

রাতের বিনিদ্র অবস্থার মধ্যে ফতিমার শুধু এই কথাই বারে বারে মনে হতে লাগল যে, এরপর আর সহজভাবে স্বামীর, সাথে বাস করা চলবে কিনা। শরীরের ওপর অত্যাচার ত' শুধু দেহটার ওপর দিয়েই যায় নি, মনেও যে গভীর ক্ষতের ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে গেচে। তাই যুক্তিতর্ক, বুদ্ধিবিবেচনা, সবার ওপর দিয়েই অবুঝ মন কেঁদে কেঁদে উঠতে লাগল : না, না···আর হয় না—আর হয় না—

কান্নার বেগ সামলে নিয়ে সে আবার ভাবতে বসল : আচ্ছা, বেশ ! কিন্তু তারপর ? কদিন ত' ঠায় উপোস চলেচে···আর কদিন চলবে ? একা হ'লে হয়ত কালু চালিয়ে নেবে, সে থেকেই ত' বিপদ বাধিয়েছে।

আজকের নির্যাতনের মূল কারণও যে সে-ই, এ সম্বন্ধে ফতিমার কোন সংশয় ছিল না।

ফতিমা ভাবল : আচ্ছা, সে যদি মরে, তবে কি হয়! সব দিক দিয়েই ভালো হয় না? সে বেঁচে থাকলে তাকে নিয়েই জমিদারের সঙ্গে দাঙ্গা বাধবে আর তার ফলাফল এত সুনিশ্চিত যে, ফতিমা শিউরে উঠল। না। বেঁচে থেকে সে অনেক দাগা দিয়ে গেল স্বামীকে···

অজ্ঞাতে দু'চোখ তার জলে ভেসে যাচ্ছিল, হাত দিয়ে চোখের জল মুছে সে উঠে বসল।

নিদ্রিত স্বামীর মুখের দিক অনেকক্ষণ সজল অতৃপ্ত চোখে তাকিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। তারপর আস্তে ঝাঁপ খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

আকাশের এক কোনে শুকতারাটা দপদপ করে জ্বলছিল।

ভোর রাতের দিকে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে কালু যখন উঠে বসল, তখন পেটের আগুনে তার বত্রিশ নাড়ী হজম হয়ে যাবার জোগাড় হয়েচে।

সে ডাকল, ফতি—

সাড়া না পেয়ে সে তাকিয়ে দেখল—ফতিমা নেই। উঠে দাওয়ায় এসে জোরে ডাকল, ফতি—

দাওয়ার ওপর রাতের সেই নোটখানা কোঁচকানো অবস্থায় পড়ে ছিল। সেটার দিকে দু' একবার তাকিয়ে সে ডাকল, ফতি—

এবারেও কোন সাড়া না পেয়ে সে ভাবল, ফতিমা নিশ্চয়ই পাশের বাদাড়টায় ফল-পাকড়ের সন্ধানে গেচে। মনে মনে খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে, সে ডোবার দিকে চলল হাত মুখ ধুতে।

ছোট্ট পানা পুকুর। ধার থেকে একটা পিটুলী গাছ জল ছুঁয়ে নুয়ে পড়েচে। তারি তলায় পানার মধ্যে কি একটা ভাসছিল। একটু নিপুণভাবে তাকাতেই ফতিমার ছেঁড়া ডুরেটার মতো খানিকটা কাপড় কালুর নজরে পড়ল।

বিদ্যুৎশিখা যেমন ক'রে আকাশের বুক চিরে ঝলসে যায়, কালুর মাথার মধ্যে একটা আশঙ্কা তেমনি মুহূর্তে খেলে গেল। সে রুদ্ধ-নিশ্বাসে পিটুলী গাছটার দিকে ছুটল।

ফতিমার মৃতদেহটা পাঁজা কোলা করে এনে কালু দাওয়ার ওপর রাখল। চোখ তার শুকনো—অসম্ভব রকম রাঙা। হাঁটুর ওপর ফতিমার মুখটা তুলে সে আচ্ছন্নের মত বসে রইল!

অভিভূত ভাব কেটে গিয়ে যখন তার জ্ঞান হল, তখন রোদ উঠেচে, আর সমস্ত শরীর উত্তেজনায়, অবসাদে, শোকে, ক্ষিদেয় ঝাঁ ঝাঁ করচে।

আর একবার ফতিমার প্রাণহীন মুখের দিকে তাকিয়ে, খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বসে থেকে, সে হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর কম্পিত পদে দাওয়ায় পড়া নোটখানা তুলে নিয়ে খাবারের দোকানের উদ্দেশে ছুটল।





দোতালা ডেকের রেলিং-এর পাশে দাঁড়িয়ে পশ্চাদ্‌গামী জলধারার ভেতর নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম, কখন যে সারাদিনের ডানপিটে দুরন্ত হাওয়া আসন্ন অন্ধকারের ভয়ে দম বন্ধ ক'রে একেবারে চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে গেচে, টেরও পাইনি।

সচল ও অচল রঙ-বেরঙের পোঁটলা-পুঁটলি সমেত একজন মাঝ-বয়সী যাত্রীর কথায় চমক ভাঙল। লোকটি পানের রসে লাল টকটকে মুখ বিবর থেকে এক-হাঁ ধোঁয়া ছেড়ে বলল···গোতিক বর সুবিদার না জোগন্নাথ, ঝোড় বিষ্টি আইব মনে লয়।—বুচি লো! চূণ দে দেহি এট্টু—

সতরঞ্চির ওপর হুঁকো ও গামছা-বাঁধা জলতরঙ্গ টিনের তোরঙে ঠেস দিয়ে আজানু গোলাপী পাঞ্জাবী ও তদুপরি নীল স্ট্রাইপ দেওয়া টুইলের গল্‌ফ কোট গায়ে একটি বছর সাতাশ-আটাশের মদনমোহন শুয়েছিল। বোধকরি তারই নাম জগন্নাথ। সে চট ক'রে কপালের লতায়িত কেশগুচ্ছের ওপর হাত বুলিয়ে নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, ডাইল! হালার আপনার য্যত গ্যাঁজাখুরী কথা! হুদাহুদি ঝোড় আইব ক্যান? আর আহেই যদি হালার ডর কিয়ের? আমরা ত' আর হালার জ্বাইলা ডিঙ্গিতে য্যাইতাছিনা!

॥ দুর্যোগ ॥

আকাশের দিকে চেয়ে মনে হ'ল ঝড় আসা বিচিত্র নয়। সমস্ত আকাশের রঙ পাংশু—পিঙ্গল, ঈশান কি নৈঋত, কি একটা কোনে হিংস্র শ্বাপদের মতো একরাশ ঘোর কালো মেঘ শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়বার আগের মুহূর্তের মতই ওঁৎ পেতে বসেচে। তীরে গাছের পাতা স্পন্দহীন, কেবল স্টীমারের আশপাশ ঘুরে গাঙচিলের ওড়ার আর বিরাম নেই। চারদিকে কেমন একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা থম্‌থম্‌ কর্‌চে।

প্রকৃতির আসন্ন তাণ্ডবের আশঙ্কা যাত্রীদলের মধ্যে সংক্রামিত হ'য়ে গেচে। সবার মুখেই একটা সংহত উদ্বেগের আভাস। আমার মন্দ লাগছিল না। দেখাই যাক। মাঝ পদ্মায় ঝড়ের কথা শুনেচি ঢের, পড়েওচি; কিন্তু সাক্ষাৎ পরিচয়ের যোগাযোগ ঘটে ওঠেনি, 'জান্ পহ্‌চান'টা এবার যদি হয়েই যায়, মন্দ কি?

একজন ইজের-পরা মাল্লা যাচ্ছিল। সুধোলাম, কিহে বাপু, ঝড় টড় হবে নাকি?

উত্তরে সে কালিমাখা হাত নেড়ে ও দাড়ীর আড়ালে একগাল হেসে, দুর্বোধ্য চাঁটগাঁয়ে ভাষায় যা' বললে, তার অর্থবোধ দূরের কথা, মর্মগ্রহণ করতেই আমার হ'য়ে এল। কিছুক্ষণ ভেবে-চিন্তে মনে হ'ল সে বলচে, তা হ'লেও হ'তে পারে। এখন ত' তুফানেরই সময়। তবে ডর নাই।

—ভয়-ডরের কথা নয়, আদপেই ঝড় হবে কিনা, তাই সুধোচ্চি।

খালাসী সায়েব চলতে সুরু করেছিল, কথার জবাব দিল না।

কিন্তু জবাব পেতেও দেরি হ'ল না, যদিও পেলাম একটু নতুন রকমে। খানিক আগের স্থির-অচঞ্চল প্রকৃতিকে ঝাঁকুনি দিয়ে একটা

দমকা হওয়া ব'য়ে গেল, পিছু পিছু বড় বড় ফোঁটার চড় বড় শব্দে নহবৎ সুরু হ'ল।

যাত্রীদের চাঞ্চল্য কোলাহলে গিয়ে পৌঁছুলো। কানাত নামানো, সতরঞ্চি গুটানো, বাক্স প্যাঁটরা সামাল ও তারি সাথে সাথে পূর্ববঙ্গের সব ক'টা জেলার ভাষায় সমস্বরে চীৎকার,—সে এক দৃশ্য! হঠাৎ চোখে পড়লো একটি লোক আমার পাশ কাটিয়ে ফিমেল কম্পার্টমেণ্টের ধারে গিয়ে আপাদ-গ্রীবা সতরঞ্চি মুড়ি দিয়ে উবু হ'য়ে বসল। সন্তর্পণে একবার কপালের কেয়ারীতে হাত বুলোতেই চিনতে পারলাম, সে পূর্বোক্ত শ্রীমান জগন্নাথ। হাবভাবে বুঝলাম শ্রীমান ভীত হয়েছেন।

বাইরে তাকিয়ে দেখি কয়েক মিনিটের মধ্যে সব ওলট পালট হয়ে গেচে। আকাশ-কোনের শ্বাপদ জন্তুটা দেহ-বিস্তার ক'রে আকাশের অর্দ্ধেকের বেশী গ্রাস করে ফেলেচে। অন্ধকারে কিছু চোখে পড়েনা, থেকে থেকে চারদিক মৃদু আলোক-কম্পনে চম্‌কে চম্‌কে উঠচে। সে আলোয় ধূসর বৃষ্টি-ধারা ভেদ করে দৃষ্টি চলে না, একটু গিয়েই প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। শিকার কায়দায় পেয়ে ক্ষুধার্ত বাঘ যেমন উদ্বিগ্ন আনন্দে গোঙরাতে থাকে, সমস্ত আকাশ জুড়ে তেমনি একটা শব্দ হচ্চে।

হঠাৎ তিমিরঘনরাত্রির সমস্ত আবরণ নিঃশেষে পুড়িয়ে দিয়ে একটা অতি তীব্র ঝাঁঝালো বিদ্যুচ্ছটা ঝলসে উঠল, নিমেষমধ্যে জলস্থল কাঁপানো বিকট বজ্র-নির্ঘোষে চরাচর স্তম্ভিত, মূক হয়ে গেল। মনে হ'ল যে প্রকাণ্ড আকাশটা ভেঙেচুরে নদীর বুকে এসে আছড়ে পড়ল।

ভয় পীড়াদায়ক সম্ভাবনার আতঙ্কে, পরিণতির মধ্যে ভঁয়—

ভয়ানক নয়। তাই দৈত্যপুরীর সব ক'টা দানব যখন বাঁধন-হারা উন্মত্ত-উল্লাসে একসাথে ঘাড়ে এসে পড়লো, তখন একটা উচ্ছৃঙ্খল বেপরোয়া সাহসে মনটা ভ'রে উঠল।

ডেকের দিকে তাকিয়ে দেখি হাওয়ার তোড়ে স্টীমার কাত হয়ে গেচে। সমস্ত যাত্রী ঝড়ের আক্রোশ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে নিচু দিকটায় গিয়ে জমায়েত হয়েচে। কোথায় কানাৎ, কোথায় কি! সব উড়চে। আবালবৃদ্ধবনিতার মিশ্র কলরব ছাপিয়ে দু'একজন মানব-হিতৈষীর গলা পাওয়া যাচ্চে।

—যান, যান, আপন আপন জায়গায় যান! গাদি ক'রবেন না এক মুরায়,—ভ্যাহেন না হালার জা'জ কাইত অইয়া গেছে—

উপদেশ শোনা ও তদনুসারে কাজ করার মতো স্থান ও কাল সেটা নয়, তাই নিজ নিজ জায়গার ওপর কারো বিশেষ আকর্ষণ দেখা গেল না, যিনি পরামর্শ দিচ্ছিলেন, তাঁরও না।

বাহিরে অষ্টদিকপালের মাতামাতি সমানে চলেচে। অবিরল বৃষ্টি, অবিশ্রান্ত বিদ্যুৎ, আকাশের অশ্রান্ত সরব আস্ফালন, সমস্ত ডুবিয়ে উন্মত্ত বায়ুর অধীর হুঙ্কার! তারই ভেতর দিয়ে আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল 'বাজার্ড' স্টীমার, বায়ুতাড়িত হ'য়ে কোন এক ঝড়ের পাখীর মতই সবেগে ছুটে চলেচে।

হঠাৎ মনে হ'ল কে যেন ডাকচে। কাকে, কে জানে! ওকি, আমাকেই—

—শুনুন, একবার এদিকে—

চেয়ে দেখি মেয়ে-কামরার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বছর কুড়ি-বাইশের

একটি সাদাসিদে হিন্দু ঘরের মেয়ে। আমি এগিয়ে যেতেই তিনি ব্যগ্রভাবে বললেন, অবি—অবিনাশ বাবুকে ডেকে দেবেন একটু? অবিনাশ বোস। অনেকক্ষণ হ'ল নিচে গেচেন, ফেরেননি। তিনি আমার স্বামী।

তাঁর চোখের জল বোধহয় বৃষ্টির জলে ধুয়ে গেছল, কিন্তু গলার আওয়াজে টের পেলাম—তিনি কাঁদছিলেন। আমি বললাম,—আপনি ঘরে গিয়ে বসুন, আমি ডাকচি তাঁকে।

তিনি সেইখানে দাঁড়িয়েই বললেন, আমি ঠিক আছি—আপনি যান।

—ভিড় ঠেলে নিচে নামতে নামতে মনে হ'ল, যে বিপদে গেরস্ত ঘরের বউ অসঙ্কোচে স্বামীর নাম উচ্চারণ করে ও একান্ত অজানা পর-পুরুষের সাথে সপ্রতিভ কথা কয়, সে বিপদ আর যাই হোক—সামান্য নয়।

—স্টীমার অসম্ভব দুলছিল। শুনলাম এঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়া হয়েচে, হাওয়ার মুখে যে দিকে যায় যাক্। সারেঙ হাল ধরে বসে আছে।

উন্মত্তা এলোকেশী প্রকৃতির বিরামহীন তাণ্ডব থেকে থেকে আচমকা অট্টহাসিতে ভীষণতর হয়ে উঠচে।

ডেকের মথিত বিধ্বস্ত জন-সংঘের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে পথ ক'রে নিয়ে অবিনাশ বাবুর খোঁজ সুরু করলাম। স্টীমার দুলচে, পা ঠিক রাখা শক্ত, তার ওপর ধাক্কা-ধাক্কি—একটা লোহার থামে ঠুকে গিয়ে খানিকটা জখম হ'ল কপালে।

বাধা ও বিফলতায় যে মরিয়া ভাবটার সৃষ্টি করে, সেটা উৎসাহ নয়, উন্মাদনা। অসাফল্যের লজ্জাকে বরদাস্ত করার লজ্জা, সে উন্মাদনার মুখে আমি কেন—কেউই মানতে রাজী নয়। তার ওপর দু'টি সিক্ত চোখের সনির্ভর মিনতি···সব রকম দুঃসাধ্য কাজেই তার জোরে হাত দেওয়া যায়। গলা চড়িয়ে ডাক ছাড়লাম,—অবিনাশবাবু, অবিনাশবাবু—

যাত্রীদের আর্ত কোলাহলে আমার গলা ডুবে গেল। অবিনাশবাবুকে বার করা সম্ভব হবে ব'লে মনে হ'ল না। আর সে ভদ্রলোকেরও বলিহারি যাই, পথে স্ত্রী সাথে করে বেরিয়ে এই দুর্যোগে বেমালুম তার কথা ভুলে বসে আছেন। একবার পেলে এক হাত নোব—

ডেক, সেলুন, হস্পিটাল, কোথাও তিনি নেই। চেঁচিয়ে গলা ধরে গেচে, জামাকাপড় ভিজে একাকার, কপালে রক্তের দাগ—তখনকার চেহারা সম্বন্ধে তখন কোন কথা মনে হয়নি এই রক্ষে। তবে অবস্থাটাও তখন খুব স্বাভাবিক ছিল না, এটা মানতে হবে।

এইবার নিচের পালা। সিঁড়ি বেয়ে কিছুদূর যেতেই একটা প্রবল দমকা ঝাপটে জাহাজ বাঁদিকে আরও কাত হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গেল, গেল—সব গেল, ধরনের একটা মিশ্রিত কোলাহল, মিলিত কণ্ঠের অমন অসহায় করুণ আর্তনাদ আর কখনও শুনিনি। মুহূর্তের জন্যে হিমশিহরণে আমার সংজ্ঞা অসাড় হ'য়ে এল, মনে হ'ল পড়ে যাব।

ধীরে সামলে নিয়ে দৃঢ়পদে নিচে নেমে এলাম। নিচের দৃশ্য আরও ভীষণ। যেদিকে যাত্রীদল ভিড় করেছিল, সেদিকে বেশি জল ওঠায় সবাই মাঝামাঝি একটা জায়গায় জমে গেচে। আর খালাসী

শ্রেণীর গুণ্ডা গোছের জন তিন্‌ চার লোক অকথ্য, অশ্রাব্য, গালাগাল দিতে দিতে সেই কম্পমান, ভয়ার্ত মনুষ্যপিণ্ডের ওপর নির্বিচারে দোহাত্তা কীল চড় লাথি চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের বক্তব্য স্টীমার কাত হয়ে গেচে, জল উঠচে,—উল্টো দিকটায় যেতে হবে—নইলে বিপদ।

তাদের কথা যুক্তিহীন নয়, বৃষ্টি ও হাওয়ার তোড় তুচ্ছ ক'রে উঁচু দিকে যাওয়া উচিত, তাও বুঝলাম। কিন্তু যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্যে যে প্রণালী অবলম্বন করা হয়েচে, সেটা খুব সুষ্ঠু ঠেকল না। নেমে গিয়ে পেছন থেকে খালাসী ক'টার পিঠে তাদেরই প্রদর্শিত পথে মুষ্টি ও পদাঘাত করলাম। ভাগ্য ভাল, ভিড় থেকে দেখতে দেখতে জন দশ বারো এগিয়ে এসে আমার সাথে যোগ দিল।

মারামারিটা যখন জমে উঠেচে, তখন আমি টুক ক'রে বেরিয়ে এসে হাঁক ছাড়লাম, অবিনাশবাবু, অ—অবিনাশবাবু—

এখানেও বোস মহাশয়ের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না।

এঞ্জিন পেরিয়ে সামনে এলাম। সেখানে তেমন ভিড় নেই। ডাকঘরের কাঠের কুঠরীর আনাচে-কানাচে পার্শেলের মালপত্রের পাহাড়, খবরের কাগজ থেকে চিটে গুড়ের জালা পর্যন্ত সবরকম জিনিষই বর্তমান। একপাশে জন দশ বারো কুলি, পুরুষ ও মেয়ে দুই-ই, জড়সড় হয়ে ঝড়ের ঝাপট থেকে শরীর বাঁচানোর বৃথা চেষ্টা করচে। দু'একজনের ছেঁড়া নোংরা কাঁথা আছে, তারা তাই মুড়ি দিয়ে বসে আছে। বেশির ভাগই নগ্নগাত্র, পরনে শুধু একটি নেংটি।

এইবার হতাশ হ'লাম। এখানে একটি ভদ্রলোকও নেই—কাজেই অবিনাশবাবুও যে নেই সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। তবু মনে হ'ল, থাকতেও

পারেন কোথাও গা আড়াল দিয়ে, দু'একটা ডাক দেওয়ায় দোষ নেই।

প্রাণপণ শক্তিতে চেঁচালাম। আরো জোরে—আরও।

হঠাৎ মনে হ'ল, অনেক দূর থেকে যেন আওয়াজ হ'চ্চে,—কে—কে? এই যে—আমি এখানে—

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে চারিদিকে তাকাতে লাগলাম। কিন্তু—কৈ? কেউত' চোখে পড়ে না! হাঁক ছাড়লাম,···কৈ মশায়? কোথায় আপনি. অ-অবিনাশবাবু—

একটু একাগ্রমনে লক্ষ্য করতেই মনে হ'ল মালের গাদির গভীরতম প্রদেশ হ'তে জবাব হ'ল. এই যে, বড় চ্যাঙারীটার তলায়···ডাইনে···

অবাক হ'য়ে পার্শ্বেলের পাহাড়ে উঠলাম। চ্যাঙারী—একটা নয়, অনেক। দুর্গন্ধে বুঝলাম, সুটকী মাছের। তার একটার তলায় বেশ একটু গর্ত মতো হয়েচে, তারই মধ্যে ঘাড় দাবিয়ে উবু হ'য়ে বসে বিপন্না অপবিচিতার স্বামী শ্রীঅবিনাশ বোস, পাশের একটি অর্ধনগ্ন জোয়ান কুলীমেয়ের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে, বোধকরি কাব্যচর্চ্চা করছিলেন। আমাকে দেখে আমার দিকে বিরক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, কি চান মশায়?

পত্নীকে দেখে পতি সম্বন্ধে যে গুটিকয়েক ধারণা খানিকক্ষণ থেকে পোষণ করছিলাম, বোস-জা'কে দেখে সেগুলি শশব্যস্তে পলায়ন করল। চেহারার বর্ণনা না করাই ভালো, কারণ অত কুৎসিত মুখ সচরাচর চোখে পড়ে না। রঙটা ফর্সা এবং সেই জন্যেই আরো খারাপ লাগছে। পুরু পুরু কালো ঠোঁটের আনাচে কানাচে খেঁকি কুকুরের মতো শুঁয়ো শুঁয়ো চুল টিকটিক করচে। বয়েস মনে হ'ল পয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে।

একটা ধাক্কা সামলে কঠিন গলায় বললাম, বেরিয়ে আসুন।

লোকটা হুকুমের ধরণ শুনে ভয় পেল কিনা বুঝলাম না, দু'হাতে চ্যাঙারী ভর দিয়ে বেশ ক্ষিপ্রতার সাথে তিড়িং করে এক লাফে অনেকটা দূরে এসে পড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে, সতৃষ্ণ নয়নে একবার পেছনে তাকিয়ে জিব চটকে বললে, কি বলচেন ?

লোকটার হাবভাব দেখে বুঝলাম, স্ত্রীর বিরহটুকু সে ফাঁকা হা হুতাশে না কাটিয়ে একটা সদ্ব্যবহারের পথ বার করে নিয়েচে।

—আপনারই নাম অবিনাশ বোস ?

—আজ্ঞে।

—আপনার স্ত্রী রয়েছেন ওপরের ফিমেল কেবিনে ?

লোকটা একটু ঘাবড়ে জবাব দিলে, হাঁ হাঁ। কেন, কি হয়েচে বলুন ত' ? কিছু— ?

—ঘাবড়াবেন না। আপনার আক্কেলটা কি মশায় যে, এই দুর্যোগের সময় আপনি তাঁকে একা ফেলে দিব্যি এখানে রস-চর্চা করচেন ? আর ওদিকে তিনি—

আমাকে বাধা দিয়ে এইবার তিনি হুমকে উঠলেন। একজন অপরিচিত ছোকরা, প্রথমতঃ স্ত্রীর হয়ে ওকালতি করতে এসেছে, এবং দ্বিতীয়তঃ একটি সঙ্গোপন রসানুভূতিতে ব্যাঘাত জন্মিয়েছে,—কাজেই চটবার কথা ত' বটেই! বললেন, আপনি···ইয়ে, আমার স্ত্রী···ইয়ে, তোমার অত মাথাব্যথা কেন হে ছোকরা! আর ইয়ে, ভদ্দলোকের বোয়ের সাথে পরিচয়ই বা কর কোন্ এক্তারে ?

আমার হাসি পেল। চেপে সমান চ'টে বললাম, চোপ।

লোকটা মুহূর্তে গুড়িশুঁড়ি মেরে গেল।

—দায় ঠেকেচে আমার আপনার স্ত্রীর সাথে গায়ে পড়ে আলাপ করতে! তিনি নিজে এসে আমায় প্রভুর খোঁজে পাঠিয়েচেন। আপনার অদর্শনে অধীর হয়ে···বুঝেচেন?

অবিনাশ বাবু নরম ভাবেই বললেন, যেতে দিন মশায়, যেতে দিন। তাঁর ইয়ে, আমার স্ত্রীর কোনও বিপদ-টিপদ হয়নি ত'? ওকি, আপনার কপাল কেটে গেছে যে! ইয়ে, বড্ড রক্ত পড়চে!

কপালে হাত দিয়ে বললাম, ও কিছু নয়। আপনি চলুন। তাঁকে কথা দিয়ে এসেচি, আপনাকে নিয়ে যাব।

—চলুন, ব'লে একবার শেষ-মেষ সেই কুলি-মেয়েটার দিকে প্যাঁট প্যাঁট করে চেয়ে তিনি আমার সাত ধরলেন।

একটু যেতেই অবিনাশ বাবু বললেন, তা' ইয়ে, আপনি ত' আর লোক মন্দ নন! কিন্তু দেখুন দেখি, ইয়ে, ওঁর ব্যাভারটা! হুট্ করে এসে একজন ইয়ে, পর-পুরুষদের সাতে কথা কওয়াটা কি ঠিক হয়েচে?

দেখলাম লোকটা অতিশয় ইতর, তখনো স্ত্রীর সাথে আমার কথা কওয়াটা হজম করতে পারচে না। সর্বাঙ্গ আমার রাগে রি-রি করতে লাগল। ইচ্ছে হ'ল বলি, আপনার স্ত্রী ত' বিপন্না হয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন আমার কাছে, কিন্তু মশাই কি খুব ধর্মভাবে ওই কুলি-মেয়েটাকে গো-গ্রাসে গিলছিলেন?

কিছু বললাম না।

বাইরে কি ভয়ানক অন্ধকার। ঝড় পূর্ণ বেগে চলেচে। ভিতরের সমস্ত সতর্কতা, কোলাহলকে তুচ্ছ ক'রে রুষ্ট প্রকৃতির তর্জন গর্জনের আর অন্ত নেই। বিদ্যুৎ থেকে থেকে চমকে উঠচে, দুর্যোগের নিবিড়

তিমির,—সে ক্ষণপ্রভায় আরো ঘন, আরো নিষ্ঠুর হয়ে উঠেচে। আকাশের গুরু গর্জন হাওয়ার উচ্ছৃঙ্খল হাহাকারের সঙ্গে মিশে অভিশপ্তা রাত্রিকে দ'লে ম'থে, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলচে।

ওপরের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অবিনাশ বাবু বলতে লাগলেন, তখুনি জানি ইয়ে, পেটে যখন বিদ্যে ঢুকেচে, তখন, ইয়ে, স্ববাব-চারিত্তির ঠিক নেই। ডবকা বয়সটা দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না, কিন্তু ইয়ে, এমন ভোগান্তি জানলে কোন্ শালা—

আমি বাধা দিয়ে বললাম, কি বলচেন আপনি? কার কথা বলচেন?

—আর কার কথা মশাই, এই, গে'—আমার স্ত্রীর। দু'টো গুঁড়ো রেখে আগের বৌটা যখন মরল, ভাবলাম,—ধু-শালা, ইয়ে, আর ওসব দিয়ে কাজ নেই। কিন্তু হারু খুড়ো মেয়ে দেখিয়েই ত' সব বিগড়ে দিলে! হত দরিদ্র মশাই, হত দরিদ্র! বাপটার না আচে চাল, না আচে চুলো! কিন্তু আবার ইয়ে, এদিক নেই ওদিক আচে! মেয়েকে ব্রেহ্ম ইস্কুলে পড়ানো হয়েচে! তখন কি ছাই অত ভেবে দেখেচি! বয়স কুড়ি শুনেই আমার নোলায় জল এল! ইয়ে, এলাম ঘুরে সাত পাক! কিন্তু এখন—

রাগ আমার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কোন মতে দমন করে বললাম, কি এখন? কি করেচেন তিনি?

লোকটার লালসা, নীচতা, এমন ইতর হয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল যে, আমার মনে হচ্চিল ওকে মেরে হাড় গুঁড়ো করে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দিই!

ভেঙচানো সুরে জবাব হ'ল, না, করেননি কিছু! তবে নবেলী

ক'রে একজন বাইরের পুরুষের সাথে কথা কইলেন আজ,—কাল ইয়ে, —করবেন কি কে জানে! আমায় না দেখতে পেয়ে ইয়ে···অধীর! ···ইয়ে, বিরহ······!

লোকটা চুমকুড়ি দিয়ে হেসে উঠল।

আমি আর সামলাতে পারলাম না। তড়িৎবেগে এক হাতে লোকটার ঘেঁটী চেপে আর এক হাত মুঠো ক'রে তার নাকের ওপর তুলতেই সে বাধা দিতে দিতে ওপাশে চেয়ে ব'লে উঠল, ইয়ে, ওকি··· সন্থ···তুমি······!

আমার হাত অসাড় হ'য়ে খসে এল।

চকিতবিদ্যুতালোকে দেখলাম, অবিনাশ বাবুর স্ত্রী পাথরের মতো স্থির অপলক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে। দু'ঠোঁট রক্তশূন্য —পাংশু!

আমি সেখান থেকে সরে এলাম।

ঝড়ের বেগ বোধহয় কমচে। বৃষ্টি ধরেচে, থেকে থেকে হু হু করে হাওয়া বইচে। নৈশ প্রকৃতি দুরন্ত ছেলের মতো দিনমানের হুটোপুটির পর শ্রান্ত অবসাদে এলিয়ে পড়েচে। তার গা থেকে ডানপিটেমীর চিহ্ন মেলায়নি। কিন্তু ঠোঁটের কোনে কোনও উদ্বেগ নেই।





কম্পিত ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে ধরে দাস সায়েব উঠে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। ভারী চোখের পাতার কোন থেকে বড় বড় ফোঁটা স্ফীত নাকের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো। জানালার শার্সীতে হাত ভর দিয়ে, তারই মধ্যে মুখ গুঁজে সরকারের খেতাবী উজীর, পঞ্চাশ বছরের বুড়ো দাস সায়েব ছেলেমানুষের মতো ফুঁপিয়ে উঠলেন। আবেগ-প্রাবল্যে তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত কেঁপে উঠতে লাগলো।

নিচে লাল সুরকীর সরু রাস্তা ধরে ডাক্তারের টু-সীটার সশব্দে বেরিয়ে গেল।

পেছন থেকে মিসেস দাসের গলা শোনা গেল, ওগো, তুমি এত অধীর হচ্চো কেন? যা গেছে, তা কি ফিরবে আর? আর কষ্ট কি তোমারই একার? আর কারো বুকে কি তোমার মতই লাগেনি? কথা শোন···এদিকে এস—

দাসের কাঁধে হাত রেখে মিসেস দাস কোমর থেকে একটা সিল্কের রুমাল বের করে, চোখ মুছে ও নাক ঝেড়ে, কপালে হাত দিয়ে চুল ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে বললেন, এখনকার যা কাজ সে সম্বন্ধে তো উদাসীন থাকলে চলবে না। সোফারকে গাড়ি দিয়ে মার্কেটে পাঠিয়েছি ফুল আনতে, রতন নিচে ফোনে বসে আছে রাজ্যিশুদ্ধ লোকের শোকপ্রকাশের জবাব দিতে।

॥ স্বাহা ॥

দাস সায়েব কাঁধ থেকে মিসেসের হাত নামিয়ে দিয়ে তাঁর দিকে না তাকিয়েই ক্লান্ত ধরা গলায় বললেন, আমায় মাপ করো লীলা, যা করবার তুমিই ক'রো, ওসব তুমিই ভালো বোঝ। আমি একটু একা থাকতে চাই।—ব'লে স্খলিত পায়ে তিনি ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মিসেস মিনিট খানেক বোকার মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কাঁধ ঝাড়া দিয়ে স্বামীর উদ্দেশ্যে বললেন, মেয়ে তোমার শুধু একারই মরেনি, তাই বলে ঢঙ করতে শিখিনি আমরা। বাড়াবাড়ি কিছুরই ভালো নয়, দু'ফোঁটা চোখের জল বেশী ফেললেই কি আর মরা মেয়ে ফিরে আসবে? যখনকার যা, তখনকার তা। মেয়ের শোকে এখনকার কর্তব্য ভুললে চলবে কেন?······দেখি কাদের ওখান থেকে আবার ফুল নিয়ে চিঠি এসেচে, জবাবটা লিখে দিগে—

আর একবার কপালে ও চুলে হাত বুলিয়ে তিনি দ্রুতপদে নিচে নেমে গেলেন।

ড্রইংরুমের দক্ষিণে লটির শোবার ঘর। একটা দরজা মাঝে, ভারী পর্দা দিয়ে ঢাকা। ঘরের সাথে পশ্চিমে স্নানের ঘর, পূবে চওড়া বারান্দা, টবে ও অর্কিডে সাজানো। সে দিকে দু'টো দরজা। ঘরের ঠিক মাঝখানে চওড়া খাটটার ওপর আপাদমস্তক কাশ্মীরী চাদরে ঢাকা, তেইশের কোঠা না পেরতেই অচিন পথের দেওয়ানা, লটি দাস শুয়ে আছে। দু'একগাছা চুল বালিশের ওপর দিয়ে এসে এপাশে ওপাশে ঝুলছে। শোওয়ার ধরণ-ধারণ এত স্বাভাবিক, যে দেখলে মনে হয় রোজ যেমন সে খাওয়ার পর একটা বই হাতে করে শুয়েই অমনি ঘুমিয়ে পড়তো, আজো তেমনি পড়েছে। মাথার দিকে আয়নার

টেবিলে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি তেমনি সাজানো। আজ কেবল রুপোর চিরুণীটার দাঁতের ফাঁকে একগাছা চুলও বেঁধে নেই, আর টেবিলের চকচকে মেহগ্নিতে এক ফোঁটা পাউডারও পড়েনি।

লটির হাত ত্ব'খানা বুকের ওপর, মাথাটা ডাইনে কাঁধের দিকে একটু হেলানো। চাদরের ভেতর দিয়ে আর কিছু দেখা যায় না।

কিন্তু কেউ যদি মুখের চাদরটা উঠিয়ে ফেলতো, তবে দেখতে পেতো, লটির আজকের ঘুম প্রকাণ্ড প্রশান্তির ঘুম নয়। অল্প ফাঁক ঠোঁট ত্ব'টিতে অতৃপ্তির প্রত্যাশা মাখানো। মুদিত চোখের কোন বেয়ে যে অশ্রুধারা ছাপ রেখে গেছে, তার উৎস শুধু দৈহিক যন্ত্রণাই খুলে দেয়নি। নাকের ডগার যে লালিমাটুকু মরণ এখনো মুছে নিতে পারেনি, তার পেছনে অনেক অনুক্ত বেদনার কাহিনী পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।

লটি দাস···সোসাইটির নামকরা সুন্দরী মেয়ে লটি! রূপে গুণে তার তুলনা ছিল না। যে পার্টিতে তার যাওয়া হত না, সেখানকার ছেলে বুড়ো সবাই মনমরা হয়ে উঠতো তার অভাবে। যে ডিনারে সে যোগ দিত না, সেখানকার প্রত্যেকটি ডিশ বিস্বাদ হয়ে উঠতো। তার একটি কথা রাখবার জন্যে দরকার হলে কেউ কেউ প্রাণ দিতে পারতো। ছোকরা ব্যারিষ্টার সরকার বিলেত থেকে গোঁফের ধার ছেঁটে মর্কট সেজে এসেছিলো। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন কেউ তাকে বড় করে রাখতে অথবা কামিয়ে ফেলতে রাজি করাতে পারেনি। লটির একবার নাক সেঁটকানোর মর্জিতে সে-জোড়া সমূলে অন্তর্হিত হয়েছিল। ষাট বছরের বুড়ো, পেনশানভোগী সিবিলিয়ান হালদার সায়েব, তাঁর তিরিশ বছরের মৌতাত, হাভানা শুদ্ধ লটিকে তুষ্ট করবার জন্যে ছেড়ে,

সিগারেট ধরেছিলেন। সমাজে লটির ‘প্রতিপত্তি ছিল অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মতো।

ঘণ্টা দুই-আড়াই হ’ল লটির মৃত্যু হয়েছে, এরি মধ্যে ফোনে ও লোকের মারফৎ খোঁজ খবরের ভিড় সুরু হয়ে গেচে। একতলার হল-কামরা কালো পোষাকে ও ক্রেপে অন্ধকার হয়ে উঠেছে। সাদা ফুল লটির ঘরে আসছে, ঘর ভরে উঠলো বলে। সমাগত শোক প্রকাশকদের নিয়ে মিসেস দাসের ব্যস্ততার আর অবধি নেই। আদর, অভ্যর্থনা, ঘন ঘন শুকনো চোখে রেশমি রুমাল বুলোনো, ‘মিষ্টার দাসের হঠাৎ এই খানিক আগে শরীরটা—’ বলে তাঁর হয়ে মাপ চাওয়া—অনবরত চলছে। অভ্যাগতদের মধ্যে কলকাতার বড়দরের কতিপয় ইংরেজ ও বহু বাঙালী সায়েব মেমের মধ্যে বিশেষ কেউ আর বাকি নেই। কেউ বিষণ্ণ মুখে চুপ করে আছেন, কেউ মিসেস দাসকে দু’একটা সান্ত্বনার কথা বলছেন —কেউ চাপা গলায় অস্ফুটস্বরে লটির বিষয়ই আলোচনা করছেন।

যাঁরা আসতে পারেননি তাঁদের মধ্যেও লটির মৃত্যুসংবাদ কম আলোড়নের সৃষ্টি করেনি। কেউ হয়তো হাইকোর্ট বেরোবার মুখে খবর পেয়ে ফিরে এসেছেন, লটি, লটি দাস! এমন হঠাৎ—কেন, কি হয়েছিল তার! এমন শক্ত কিছু হয়েচে বলেতো আগে শুনিনি—

একটু একটু ক’রে তাঁর মাথায় সমস্ত স্মৃতি একের পর এক ভেসে উঠছে।

—লটি আমায় দু’টো ফুল দিয়েছিল দে’র গার্ডেন পার্টিতে। দিন কয়েক পর আমি একটা ব্রোচ প্রেজেণ্ট নিয়ে যেতে তার মুখ ভার,··· শেষে মায়ের তাড়ায় বেচারিকে রাজি হ’তে হ’ল। মিসেস সরকারের

বুক্-টিতে সে way of an eagle হয়ে গেছল। প্রথম ধরি আমি —good gracious! ওকি বারোটা! ডি, সি-র সাথে একটা কনসলটেশন ছিল যে,—ঘড়িটা বেগড়ায়নি তো!···

সকাল প্রায় সাতটায় লটির মৃত্যু হয়েছে। শরীরটা অসুস্থ ছিল ক'দিন থেকে, কাল সারাদিন ঘর থেকে বারই হয় নি। আজো সকালে চা খেয়েছে ঘরেই। খানিকক্ষণ পরে বাথরুমে গোঙানির শব্দ শুনে মিসেস দাস ছুটে গিয়ে দেখেন, সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। আসল ব্যাপার কি, আর কারো জানা না থাকলেও মিসেসের অজানা ছিল না। কিন্তু সে কথা তিনি যে জন্যেই হোক, কাউকে বলা উচিত মনে করেননি। সেবা শুশ্রূষা ডাক্তার কিছুরই ত্রুটি হয়নি, কিছুতেই তাকে ধরে রাখা গেল না, এমন কি যে মায়ের কথা সে জীবনে কোনদিন ঠেলেনি, তাঁর সহস্র কাতরোক্তিতেও না।

ডাক্তার পরীক্ষা করে সবই বুঝতে পেরেছিলেন, দাস সায়েবকে বলেও গেছেন। কিন্তু সেতো বাইরে বলা চলে না। মিসেস দাস সবায়ের প্রশ্নের জবাবে বলছেন, না। স্লিপ করে বাথরুমে পড়ে গিয়ে মাথা ঠুকে যায় ওয়াশ বেসিনের কোনায়; ব্রেইন কঙ্কাশন, দু' ঘণ্টা পুরোও রাখা গেল না,—সঙ্গে সঙ্গে চোখে রুমাল।

মিসেস দাসকে হৃদয়হীনা মনে করলে ভুল করা হবে। হৃদয় তাঁর সত্যিই ছিল, শুধু মায়া-মমতার জায়গায় সোসাইটি ও ফ্যাশন তাঁর সবটুকু জুড়ে ছিল। নিজে তিনি ছা-পোষা ঘরের মেয়ে। পঁচিশ বছর আগে যখন ডেপুটি নরেন দাসের সাথে তাঁর বিয়ে হয়, দাস তখন যাযাবর বৃত্তি ধরে বাংলাদেশের মহকুমায় মহকুমায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

দাসের মতামত বরাবরই একটু সায়েবী। ওটা পৈতৃক উত্তরাধিকার,

তাঁর বাবা রমেশ দত্তদের আমলের ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন হিন্দু ছিলেন। কিন্তু স্ত্রীর বিলিতিয়ানায় তাঁকেও মাঝে মাঝে ব্যস্ত হয়ে উঠতে হ'তো। মুখে কিছু বলা সম্ভব হ'ত না, কিন্তু মনে মনে তিনি স্ত্রীর ধরণ-ধারণ অপছন্দ করতে সুরু করলেন।

বিয়ের বছর তিনেক পর যখন লটি হ'লো, মিসেসের নবউন্মেষিত সভ্যতার চক্ষু গিয়ে তার ওপর পড়লো। স্বামীর কাছে আমল না পেয়ে তিনি মেয়ের শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে পড়লেন। লটির বছর ন'য়েক বয়েসের সময় তিনি স্বামীর কর্মস্থল পিরোজপুর মহকুমা ত্যাগ করে সকন্যা দার্জিলিং-এ সমারূঢ়া হলেন। উদ্দেশ্য স্থায়ী অবস্থান, উপলক্ষ্য মেয়ের শিক্ষা।

মায়ের নিপুণ তত্ত্বাবধানে মেয়ের পড়াশুনা ও তার ফিরিঙ্গীয়ানা তড়িৎগতিতে অগ্রসর হ'তে লাগলো। সতেরো বছর বয়সে লটি 'পিয়ার্সন ম্যাগাজিনে কবিতা ও ত্রিলোক মানে তিন্‌ঠো আদমী বলতে শিখলে।

কুড়ি বছর বয়েসে তার পিয়ানো বাদন ও ইংরেজী অভিনয় পটুতার খ্যাতি দার্জিলিং মেলে সাঁড়া ব্রিজ পার হয়ে কলকাতায় এসে পৌঁছোলো।

এই সময় একদিন 'কলকাতা গেজেটে' খবর বেরোলো যে, দাস সাহেব অস্থায়ীভাবে অতিরিক্ত জেলা কলেকটরের পদে উন্নীত হয়ে আলিপুরে বদলি হয়েছেন।

কলকাতায় এসে প্রথম শ্রেণীর ইঙ্গবঙ্গ সমাজে মিশতে ডেপুটিজায়ার যে অসুবিধে, মেয়ের দৌলতে মিসেস দাস তা কাটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। লটির খ্যাতি প্রতিপত্তির জোরে হোমরা-চোমরা বাঙালি সায়েব-মেম মহলের সব দরজাই তাঁর জন্য উন্মুক্ত হতে লাগতো।

লোয়ার সারকুলার রোড়ের এক ফ্ল্যাটে দাস সায়েব বাসা নিয়েছিলেন। আসবাবপত্র এলো পার্ক স্ট্রীটের বিলিতি দোকান থেকে, মোটরও এলো একখানা—ফোর্ড। মোটর নিয়ে সায়েব মেমে প্রথম দিনই বচসা হয়ে গেল। মিসেস বললেন, আমি হেঁটে বেড়াবো সেও ভালো, কিন্তু তোমার কলের টমটমে চড়তে পারব না।

দাস ফাইল থেকে মুখ না তুলেই বললেন, বেশ তো! বয়েস হলে হাঁটার মতো ভালো জিনিষ কি আর আছে?

মিসেস ঠাট্টা গায়ে না মেখে বললেন, মল্লিক সায়েবের মেম ডেমলার কিনলে সেদিন, তারাও তো আর ক্যাশ সব টাকা দেয়নি!

—সত্যি কথা। মল্লিক নগদ দেয়নি, কিন্তু দেবে। অর্থাৎ দিতে পারবে। কারণ মাস গেলে সে বেতন পায় সাতাশশো, আর আমার? হপ্তা খানেকও হয়নি, সাড়ে আটশোর কোটা পেরিয়ে বারোশো পঁচাত্তরে ঠেকেচে।

জবাবে মিসেস দুর্বোধ্যভাবে যা-তা বলে উঠে গেলেন।

কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই ওই ফোর্ডগাড়ি, কলকাতার সবচেয়ে দামী গাড়ি হয়ে উঠলো। ওই গাড়িতে লটির পাশে একটু বসবার জায়গা পেলে, বহুৎ রোলস মিনার্ভা-র মালিকও নিজেকে ধন্য মনে করতে লাগলেন। দেখে শুনে, মিসেস দাস হেঁটে বেড়ানোর শুভ সংকল্প ত্যাগ করলেন।

সোসাইটি পুরোমাত্রায় চলতে লাগলো।

দিন কতক পর একদিন রাতে শুতে যাবার আগে দাস সায়েব মিসেসকে বললেন, ছাখো, মল্লিকের ছেলের সাথে লটির বেশি মেলামেশা আমি পছন্দ করিনে।

মিসেস ভ্রূ কপালে তুলে বললেন, কে, টুটু? The finest young man in society! তেরো বছর বিলেতে ছিল, পাব্লিক স্কুল আর—

—আমি জানি। একটি আস্ত বাঁদর হয়ে ফিরে এসেচে, তাও জানি।

—কে বললে তোমায়? নিশ্চয়ই কেউ চুকলি করেচে। ওগো, ঘটে যদি তোমার একটুও বুদ্ধি থাকতো, তবে তুমি এসব ভাবতেও না। অমন বাপমায়ের ছেলে, জুনিয়ারদের মধ্যে পসারও হয়েচে মন্দ নয়। আর তা ছাড়া—ও-ও-লটিকে, ইয়ে, খুব সাধারণভাবে দেখে না। কে কোথায় কি কানে তুলেচে, তাই তাকে cut করতে হবে?

স্ত্রীর দিকে একটু কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাস বললেন, শোনো লীলা, অতো কথা আমি শুনতেও চাইনি, বুঝতেও চাইনে। I don't want Mullick Jr to get thick with Lottie ব্যস্।

তিনি বিছানায় গিয়ে উঠলেন।

মিসেস কিছুক্ষণ হতভম্ভ হয়ে বসে রইলেন। তারপর তাচ্ছিল্যের সুরে বলে উঠলেন, ইস! ভা-রি-তো!

মুখে বললেন বটে, ইস্, কিন্তু স্বামীকে তিনি চিনতেন। বেশী কথার মানুষ তিনি নন, গায়ে পড়ে বড় কিছু বলতেও আসেন না। আজকের পর প্রকাশ্যভাবে টুটুর সাথে মেলামেশা যে তিনি বরদাস্ত করবেন না—এ সুনিশ্চিত। কিন্তু তা বলে তার নিজেরও তো একটা মতামত আছে। মেয়ের ওপর দাবি কি শুধু একা বাপেরই! স্বামীর কথামত চললে সোসাইটিতে মুখ দেখানো কঠিন হয়ে উঠবে যে। মল্লিক বাড়িতে তো ঢোকাই যাবে না—ছিঃ!

এমন সময় লটির গলা শোনা গেল, মাম্,—মাম্—তোমার চিঠি, নেলিদের ওখান থেকে—

—ইয়েস ডিয়ার, বলে মিসেস উঠে গেলেন।

পরদিন বিকেলে সার এস. এন. দত্তের ফটকের সামনে দাসের ফোর্ড এসে দাঁড়াতেই ইজেরকোর্তার তবকজোড়া কতিপয় ইয়ং মেন এগিয়ে এসে মিসেস ও মিস দাসকে অভ্যর্থনা করে নামিয়ে নিলে।

শেষ টান দিয়ে সিগারেটের পোড়া টুকরোটা ছুড়ে ফেলে টুটু মল্লিক বললে, by jove, Baby, you are late! ঝাড়া একঘণ্টা আমরা তোমার পথচেয়ে দাঁড়িয়ে। Couldn't you come earlier?

মৃদু হেসে লটি বললে, না ড্যাডির অপিস থেকে ফিরতে বড্ড দেরি হলো আজ, তাই—

—Hell! চলো, মিসেস দাস এগিয়ে গেছেন।

টুটু একটা সিগারেট বার করে বাঁ হাতের উল্টো পিঠে ঠুকতে লাগলো।

মল্লিক জুনিয়ারকে লটি যে খুব পছন্দ করতো, তা নয়। কিন্তু মনের অপছন্দকে ব্যবহারে প্রকাশ করবার মতো সাহসও তার ছিল না, শিক্ষাও হয়নি। টুটুর ধরণ-ধারণ ক'দিন থেকে একটু কেমন কেমন ঠেকলেও সে কিছু গায়ে মাখেনি। চলতে চলতে টুটু বললে, কি হবে এখুনি ওই বুড়োদের দলে ভিড়ে? চলো, একটু বেড়ানো যাক বাগানের দিকে।

লটি বললে, কিন্তু মাম miss করবে আমাকে—

—আশ্চর্য! তুমি কি কচি খুকী রয়েচ এখনো? মা-র আঁচল ধরে ঘুরতে হবে!

—তা নয়। তবে কারো সাথে দেখা হবার আগেই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া—

—কি হবে দেখা করে? ওখানে গেলেই তো ভায়োলেট মিত্তিরের ক্যাটকেটে গলার সুর ভাঁজা, না হয়, রেণু চৌধুরীর damned Bengali songs শুনতে হবে।

—বাঙলা গান আমার খুব ভালো লাগে।

—কবে থেকে? সেদিন পর্যন্ত তো দেখেচি, বাঙলা তুমি ভালো বোঝই না—

—তারপর শিখেচি।

অপ্রসন্ন মুখে টুটু বললে, বেশ, চলো তাহলে।

দু'জনে গিয়ে ড্রইংরুমে উঠলো।

লেডি দত্ত লটির হাত ধরে বললেন, বড্ড দেরি হলো লটি, তোমাদের। এসো এ ঘরে, কিছু মুখে দেবে চলো।

গৃহকর্ত্রীর কথা শুনে অভ্যাগতদের জনকয়েক কিচির মিচির করে উঠলো, oh dear, no! Don't rob us of her company!

হালদার সায়েব পাকা ভুরু জোড়ার ওপর প্যাঁসনেটা বসিয়ে বললেন, তা হলে বিভা, খাবারটাই এখানে আনার ব্যবস্থা করো। এসো গো, মা লক্ষ্মী, এইখানে এসো, বলে তিনি হাত ধরে লটিকে নিজের পাশে বসালেন।

লটি বসে, অল্প হেসে বললে, আজো খেয়েচেন ওগুলো!

একটু বিব্রত হয়ে অপরাধীর মতো হালদার বললেন, খুব কম মা, খুব কম। তিরিশ বছরের মৌতাত—তা আজ সমস্ত দিনে মাত্র ছ'টা খেয়েচি।

লটি বললে, বারে, বেশ তো ! আমি কি আপনাকে একেবারে হঠাৎ ছেড়ে দিতে বলেচি ? কমাতে কমাতে ছেড়ে দেবেন।

হালদার আশ্বস্ত হয়ে লটির মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, মা লক্ষ্মী ! তারপর সুধোলেন, দাস এলো না যে ?

মিত্র সায়েবের মেমের সাথে মিসেস দাস পর্দার কাপড়ের ডিজাইন নিয়ে বচসা করছিলেন হালদার সায়েবের কথা কানে যাবামাত্র বলে উঠলেন, তাঁর মাথাটা বড় ধরেচে আজ, তাই আর বেরোতে পারলেন না।

এদিক ওদিক তাকিয়ে, ভ্রুকুটি করে লটি পিয়ানোর পাশে রেণু চৌধুরীর কাছে উঠে গেল।

বাইরে, বাগানের ধারের বারান্দায় টুটু মল্লিক ও ভায়োলেট মিত্তির সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে গল্প করছিল।

আধপোড়া সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে ভায়োলেট বললে, Horrid ! গাঁজা !

মল্লিক বললে, sorry ! my brand—

—I know, but not mine বলে, ভায়োলেট আংটা আঁটা রেশমী ব্যাগ খুলে সুদৃশ্য ছোট সোনার কেস বার করে খুলে ধরে বললে, try ?

একটা তুলে, নিজের নিঃশেষিতপ্রায় সিগারেটটা থেকে ধরিয়ে নিয়ে, লম্বা একটান দিয়ে টুটু বললে, ঘাস খেলেই পারো !

—খাইনে বলেই তোমাকে চিনেচি। তারপর what about your latest ?

কপালে চোখ তুলে টুটু বললে, মানে ?

—ন্যাকা, কিছু বোঝ না, না ? ওসব আমার কাছে নয়। I am—

—কি বাজে বক্‌চো ভায়োলেট।

—আমি বাজে বক্‌চি ? খ্যাপা কুকুরের মতো লটি দাসের পাছ নিয়েচ, শুধু আমি কেন, a host of others waiting ! চোখ এড়ানো অতই সোজা !

—I say, Vi, আস্তে, আস্তে, তুমি বড্ড চেঁচিয়ে কথা কও।

—Fiddlesticks ! What do I care ? সবাই জানুক, সেইতো আমি চাই। তুমি যে কি চিজ—

—আহা চটো কেন ? কি করতে চাও তুমি, আমায় ফাঁসাবে ? সে তুমি পারবে না, তাহলে সাথে সাথে নিজেকেও ফাঁসতে হবে এবং তোমার রাঁচির মীনা মাসী—, কথা শেষ না করে টুটু রেলিংয়ে বসে দেয়ালে ঠেস দিলে।

ভায়োলেট ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। বললে, ও !—That's what you are banking on ? ভাল করেচ মল্লিক জুনিয়র, মেয়েদের তুমি চেননি। নিজে আমি যাই করে থাকি না কেন, to save that innocent kid's honour, I can risk my own—এই মুহূর্তে I shall warn Lottie এই বলে যাচ্ছি তোমাকে, আমার কথা বাদ দাও,—আমি old sport, আর সবার কথা ? যারা জানে, তারা সবাই জানে—

একটু বিব্রত হয়ে টুটু বললে, don't be silly, Violet ! হেল্লো এই যে সরকার, এসো এসো ! ওকি তোমার গোঁফ কোথায় গেলো ? দেখেচ ভায়োলেট—

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মল্লিকের দিকে তাকিয়ে ভায়োলেট বললে, বাঁচলে

এখনকার মতো। তারপর সরকারের দিকে তাকিয়ে বললে, আমি জানি। আর কেন কামিয়েচে তাও জানি।

আমতা আমতা করে সরকার বললে, হেঃ, কি জানেন আপনি? আমার খুশি আমি কামিয়েচি।

ভায়োলেট বললে, বটে, ডাকবো লটিকে?

মুখ চুণ করে সরকার ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগলো।

মল্লিক বললে, কেন ওকে ঘাঁটাচ্চো সরকার। তারচেয়ে চলো, গলাটা একটু ভিজিয়ে আসা যাক। শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেচে। যাবে নাকি ভায়োলেট?

—I refuse to drink with you.

গলা ভিজিয়ে সরকার আর মল্লিক যখন ফিরলো, তখন পিয়ানোতে লটি গান গাইছে। একপাশে পিয়ানোয় ঠেস দিয়ে ভায়োলেট একখানা বিলিতী স্বরলিপির পাতা ওল্টাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে লটির মুখের দিকে তাকাচ্ছে।

সে মুখ তাকিয়ে দেখবার মতো। যথেষ্ট হিংসার কারণ থাকা সত্ত্বেও ভায়োলেট মনে মনে তারিফ না করে পারছিলো না।

লটির গান শেষ হবা মাত্র ঘন ঘন করতালির সাথে সবাই thank you, thanks, বলে চেঁচিয়ে উঠল।

মল্লিকজায়া বললেন, একখানা গেয়েই ফাঁকি দেবে? আর একটা হোক না—সেই *lovely lads of ludlaw*—

লটি বললে, বাঃ, আমি তো খানিক আগেই আরো দু'খানা গেয়েছি। একা আমিই entertainment-এর ভার নেব নাকি? আর কারো গাওয়া উচিত—

মিসেস রায় বললেন, তা তো বটেই, বেচারী হয়রান হয়ে পড়েচে। তা' হলে ভায়োলেট, you're nearest the Piano—

ভায়োলেট বললে, আমায় গাইতে বলার সেই বোধহয় একমাত্র কারণ? Of course, I don't mind, বলে সে বসে পড়লো।

মিসেস রায় লজ্জিত হয়ে বললেন, না, না, তা কেন।

লটি উঠে হালদার বুড়োর পাশে এসে বসলো। বুড়োকে সে মনে মনে ভারী পছন্দ করতো, শ্রদ্ধাও করতো। শিশুর মতো সরল মানুষ। এই পরবেশী ও পরভাষী সমাজে তিনি যখন তাকে মা-লক্ষ্মী বলে ডাকতেন, তখন তার সত্যিই খুব ভালো লাগতো।

বসেই কব্জির দিকে তাকিয়ে লটি বললে, ঈস্, রাত যে অনেক—

—কটা?

—দশটা দশ।

—তাহলে একটু রাত হয়েচে বটে। কেমন লাগলো তোমার আজকের পার্টি?

—বেশ।

—বিভা ভারী ভালো মানুষ, না? একটু সেকেলে, তা আমাদের কাছে তাই ভালো লাগে। হালের চালচলন পছন্দ হয় না আমার, তবে বরদাস্ত করে যাই।

—তাহলে, আমাদেরও ভালো লাগে না আপনার?

—তুমি বড় কথা কাটো মা-লক্ষ্মী; আমি কি তাই বললুম? তবে, এই আজকালকার সবাই, এত ছোট সব জিনিষ নিয়ে এরা থাকে, ভালো লাগে না। চালচলনও সব কেমন যেন! এই ধর না ইয়ং মল্লিক, well, to be frank, I detest the fellow!

টুটু মল্লিক একপাল্ মেয়ের মধ্যে আসর জমিয়ে বসেছিল। লটি সেদিকে তাকিয়ে দেখলে, হালদারের কথার জবাব দিলে না।

মিসেস দাস গৃহকর্তার সাথে দামি দামি মোটরের গল্প করছিলেন। লটি তাঁকে বললে, It's getting late, Mum—

—কেন কটা বেজেচে?

—Time we were gone! সাড়ে দশ।

সার এস. এন. বললেন, সেকি এখ্‌খুনি—?

মিসেস দাস বললেন, হ্যাঁ, ওঁর শরীরটা ভালো নেই আজ।

—তা হ'লে—

হ্যাঁ, উঠি তাহ'লে। এসো লটি। ও, লটি, দেখতো গাড়ি এসেচে কিনা—টুটু মহিলাচক্র ত্যাগ করে এগিয়ে এসে বললে, ও আর দেখে কি হবে। চলুন আমিই পৌঁচে দিয়ে আসি।

লটি আপত্তি করে বললে, না, না, তাতে কাজ নেই। কি হবে খামখা। আর এত রাতে, কষ্ট করে—

—Pleasure, কষ্ট নয়, চলুন।

মিসেস দাস পুলকিতভাবে বললেন, অনেক ধন্যবাদ, টুটু, so kind of you আচ্ছা, গুডবাই,—বাই—

সম্মিলিত হাতনাড়া ও অভিবাদনের কোলাহল ত্যাগ করে তিনজনে বেরিয়ে এলেন। দু'সেকেণ্ড পর মল্লিক জুনিয়রের লম্বা নিচু স্পোর্টিং সানবীম নিঃশব্দে কম্পাউণ্ড পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

ড্রইংরুমে বসে সানবীমে টুটু মল্লিকের স্থানে নিজেকে কল্পনা করে সরকার সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে।

মাস তিনেক পরের এক রবিবার।

দুপুরের খাবার পর লটি তার শোবার ঘরে বইয়ের সেলফের কাছে বছর খানেকের জমানো ন্যাশ ও ষ্ট্রাণ্ডের পঙ্কোদ্ধার করছিলো। পরনে লালপেড়ে গরদ, গায়ে ওই কাপড়েরই একটা ঢিলে আস্তিন জামা। ভিজে চুলের বোঝা ডগায় গেরো দিয়ে পিঠের ওপর ছাড়া।

জানলা দিয়ে একরাশ হেমন্তের মিঠে রোদ তার গায়ে পিঠে এসে পড়েছে।

সে গুন গুন করে রেনু চৌধুরীর কাছে সম্প্রতি শেখা একটা বাঙলা গানের এক চরণ ভাঁজছিলো, আর তারই ফাঁকে ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে যাচ্ছিলো।

—ঘরেতে ভ্রমর এলো গুন গুনিয়ে···গুনগুনিয়ে! বারে গ্ল্যাক্সো বেবি! দেখলেই চুমো খেতে ইচ্ছে হয়!···ঘরেতে·········

দরজার কাছে শব্দ শুনে সেদিকে না তাকিয়েই সে বললে, কোন হ্যায়—

পর্দার ফাঁকে শ্বেত শ্মশ্রু 'বয়ে'র পাগড়ি দেখা গেল।

—কেয়া হ্যায়, বয়? সাব্ বোলা রাহা? বহুৎ খু'—বোলো ম্যয় আরহি—আভী হি—

উঠে টয়লেট-র‍্যাকের ওপর থেকে তোঁয়ালে নিয়ে, মুখ হাত পা ভালো করে মুছে, কপালের ওপর ব্রাশটা দু' একবার বুলিয়ে সে নিচে চললো।

বসবার কামরায় ঢুকতে গিয়েই লটি একটু অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো। দাস সায়েবের পাশে সেরিডানের ওপর একজন যুবক বসেছিল। গায়ের রং রোদে পোড়া গৌর, ঈষৎ তামাটে, চওড়া কপাল ও প্রকাণ্ড নাক—

গ্রীক ভাস্করের খোদিত মূর্তির মতো। পোষাক পরিচ্ছদ সায়েবী ও আড়ম্বরহীন। একগোছা চুল বাঁ কপালের ওপর এসে পড়েছে। বোতাম-খোলা কোটের তলায় মস্ত বড় বুকটার ওপর 'টাই' অবিন্যস্ত-ভাবে হাওয়ায় উড়ছে। ওপরকার ঠোঁটের ধার দিয়ে কয়েক ফোঁটা ঘাম ফুটে উঠেছে।

একটু ইতঃস্ততঃ করে লটি বললে, Sorry Dad জানতুম না আর কেউ আছেন।

—আর কেউ মানে দিস জেণ্টলম্যান, অর্থাৎ ডাকু তো? তোমার ঘাবড়াতে হবে না লটি, ওর সামনে তুমি at home feel করতে পারো। She is Lottie ডাকু, সেই নোয়াখালীর ছোট্ট ফ্রকপরা লটি। একে তোমার মনে নেই লটি, সেই ডাকুদা—নোয়াখালীর মিঃ রায় ছিলেন ডেপুটি, তাঁর ছেলে। তোমার তো ভালো নাম আছে ডাকু—হ্যাঁ হ্যাঁ-শঙ্কর,—শঙ্কর রায়।

শঙ্কর হাত তুলে নমস্কার করতে যাচ্ছিল, লটি হাত বাড়ালো দেখে করকম্পন করে বললে, নোয়াখালীর পরেও দেখেছি আপনাকে দার্জিলিং-এ দুয়েকবার। সানি ব্যাঙ্কে—

—আপনি ষেতেন চৌধুরীদের বাড়ীতে? দেখিনি তো।

—দুর্ভাগ্য! অথচ শেষবার ওই বাড়িতেই উঠেছিলাম। নোয়াখালীর কথা তো আপনার মনে থাকা সম্ভব নয়, তখন আপনি বেজায় ছোট।

—হ্যাঁ, তবে আপনিও সে সময় বিশেষ বড়ো ছিলেন না মনে হয়।

হেসে শঙ্কর বললে, না। এই ধরুন বারো-তেরো।

—তাই বলুন! আপনি আমার চেয়ে বছর চারেকের বড় মাত্র।

—দাস সায়েব বললেন, আচ্ছা লটি, তোমার মাকে যে ডেকে

পাঠালুম, এলেন না তো,—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিসেস দাস ঘরে ঢুকলেন। জামা কাপড়, চুল, জুতো—ফিটফাট, মুঠোর রুমালটা একবার নাকে ঘসে তিনি বসলেন।

—লীলা, চিনলে একে ? দাস সায়েব জিগ্যেস করলেন।

—অস্ফুট স্বরে মিসেস বললেন, কই—

—ভালো রে ভালো! সুরেন রায়ের ছেলে, ডাকু। সেই নোয়াখালীতে—ওঃ তুমি বেশি দেখনি ওদের বটে।

মিসেস দাস হাত বার করে বললেন, Good day, Mr. Roy—well, how do you do—

হাত ঝাঁকানো সমাধা করে, ভালো করে বসে শঙ্কর বললে, আমি বেশ আছি। আপনি ভালো তো ?

মিসেসের ছ'চোখ লাল হয়ে উঠলো। মিঃ দাস ও লটি হো হো করে হেসে উঠলেন।

দাস সায়েব বললেন, লীলা, তুমি মিঃ রয়, মিঃ রয় করচো কাকে ? ও ডাকু, নামে ও কাজেও—ব্যস্ সেই ওর যথেষ্ট পরিচয়। নামেও, কাজেও। কি বলো হে ?

লটির সাগ্রহ হাসি-রঙীন ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে ডাকু বললে, কিন্তু সমাজে বাস করে নামের সাথে খাপ খাইয়ে জীবন যাপন করলে কি আর চলবে—

—আরে বাদ দাও তোমার সমাজ! সেই ছেলেবেলার মতো ডানপিটেই রয়েচ নাকি এখনো ? মারামারি করে হেস্টিংস হাউস ছাড়লে, সে আমি এখনো ভুলিনি।

—তাইতেই তো সায়েব হওয়াটা পুরো হয়ে উঠল না। আর

দু'দিন থাকলেই খাস বিলেতিদের সাথে টেক্কা দিতে পারতুম। বলে ডাকু হাসলো, তারপর বললে, সে শুধু প্যাপীর জন্যে। খেলা-ধূলায় ওরকম বরাবর হয়, বিশেষ হকিতে। তাই বলে মাষ্টাররা মোড়লী করতে আসে না। হাতে ছিল ডাণ্ডা, মাথায়ও বোধকরি খুন চেপেছিল! কষ্ট হয় টুটু মল্লিকের জন্যে। অবশ্য তার ছোটমানষেমীর যোগ্য শাস্তি হয়েছিল। তবে মারটা একটু বেশিই খেয়েছিল। দিন দশেক ছিলো হাসপাতালে।

—কোন টুটু? মল্লিক সায়েবের ছেলে?

—হ্যাঁ, তারপরই ওর বাবা ওকে বিলেত পাঠিয়ে দেন। শুনলুম ফিরেচে নাকি বছর খানেক হ'লো।

—হ্যাঁ, বারে জয়েন করেচে। লীলা, তুমি ওর কীর্তিকলাপ শুনে ভাবচ, বুঝি ও একটি আস্ত গুণ্ডা! He is a self-made man. নিজের জোরে রেলে বড় কাজ পেয়েচে। জামালপুরে; —যাক এখন নয়, কোথায় উঠেচ এসে কোলকাতায়? হোটেলে? সে কি? সুরেনের ছেলে আমি থাকতে এসে হোটেলে উঠবে—না, না, absurd! আজই সন্ধ্যার ভেতর চলে এসো, ব্যাগ এণ্ড ব্যাগেজ। No arguments! তোমার একজন দাদা জুটলো লটি, বহুৎ বদমাস,—ডাকু দাদা।

বলে দাস সায়েব সস্নেহে তাদের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন?

মিসেস দাস গম্ভীর মুখে ঘাড় কাৎ করে পরম মনোযোগের সাথে কাঁধের ব্রোচটার শিল্প, সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করছিলেন, এইবার গম্ভীরতর ভাবে দাস সায়েবের দিকে তাকালেন।

লটি ভাবলে, ওয়েল—বেশতো! ডাকু—ডাক্‌কুদা!

তারপর ডাকুর দিকে তাকিয়ে বললে, কখন আসছেন তা হলে? সত্যি, না এলে ভারী দুঃখিত হবো আমরা, হবো না মাম্‌?

দীর্ঘ দেহ টান করে দাঁড়িয়ে ডাকু বললে, এলে আমি বেঁচে যাই সত্যি, তবে আপনাদের ভুগতে হবে।

দাস সায়েব বললেন, আচ্ছা, আদবকেতা তোমায় মানায় না। We shall expect you before tea, বুঝলে? লীলা, তোমার কোন engagement নেইতো বিকেলে?

—আছে বৈ কি। I am going to Mullick's for tea—

—বেশ লটি থাকবে।

—সেকি? ওকে তো যেতেই হবে, তাঁরা বিশেষ করে বলেছেন।

মায়ের হিপ্নোটিজম আজ যেন লটিকে কায়দায় আনতে পারলে না। সে বাধা দিয়ে বললে, না, আমি যাবো না। Not feeling up to it—

দাস সায়েব মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তাহ'লে তুমি বেরোবে না। ডাকু, তুমি ঠিক এসো তাহলে।

—আসবো। চললুম খুড়িমা। চলি মিস দাস।

ডাকু যাবার পর খানিক চুপ করে থেকে মিসেস বললেন, আমি আর্মি নেভিতে যাচ্চি, যাবে তুমি?

লটির যেন আজ কি হয়েছিলো। সে বললে, বাব্বা এই দুপুরে! আমি তার চেয়ে একটু ঘুমুবো।

—কি আলসেই হচ্চো দিন দিন।

ঈষৎ হেসে, লটি বললে, আলসে নয়, তবে দিনরাত ওই পোষাক

পরিচ্ছদ ঘাঁটতে ভালো লাগেনা আর। আমার এখন একটু পড়তে ইচ্ছে করচে।

বিস্মিতভাবে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মিসেস উঠে গেলেন। লটি সশব্দে চটিতে পা গুঁজে গুন্ গুন্ করতে করতে ঘরে চললো।

ঘরে গিয়ে লটি দেখলে, বিছানার ওপর তার জাপানী স্পানিয়েলটা দিব্যি গুঁড়িসুঁড়ি হয়ে আরাম করে ঘুমুচ্চে। অন্যদিন সে সেটাকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজে শুয়ে পড়তো, কিন্তু আজ তাকে কোলে নিয়ে চুমো খেয়ে বললে, জানিস রুবি, মেরে দাদা মিলা একঠো,—ডাক্কু, ডাক্স্, ডিক—তবে রে পাজী কুকুর, আচ্ছা নাক চেটে দিলি কি বলে, বল তো!

কোল থেকে রুবিকে নামিয়ে দিয়ে, লটি মুখে চোখে জল দিয়ে এল। তারপর একখানা বই হাতে করে শুয়ে, বইখানা খোলবার আগেই ঘুমিয়ে পড়লো।

দিন দশেক পর কলকাতা ছাড়বার দিন, দুপুরে খাবার পর লটির ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকু ডাকলে, লটি শুনছো?

—কি?

—শোনো।

লটি এসে বেতের চেয়ারটার ওপর বসলো। পাঁচিলে হেলান দিয়ে ডাকু দাঁড়িয়েছিলো, বললে, আজ আমি যাচ্চি, জানো।

—হ্যাঁ।

—দ্যাখো, ভালো করে গুছিয়ে বলা আমার ক্ষমতার বাইরে। হঠাৎ যদি অন্যায় কিছু বলে ফেলি, দোষ নিওনা।

—আচ্ছা, বলে লটি একটু অবাক হয়ে তাকালে। তারপর বললে, কিন্তু কথাটা কি তা না বলে শুধু বাজে বোকচ।

—তাহলে বলে ফেলি। ওয়ান—টু—থ্রী, তুমি আমায় বে' করবে ?

লটি অবাক। হবারই কথা, কারণ ব্যাপারটা যেমন অদ্ভুত, তেমনি অপ্রত্যাশিত। বিয়ের নানারকম প্রস্তাবের বিবরণ সে শুনেচে, পড়েচে। কিন্তু এ রকমটা তার ধারণার বাইরে। তার হাসা উচিত, না চটা উচিত কিছু বুঝতে না পেরে বোকার মতো তাকাতে লাগলো।

ডাকু হো হো করে হেসে উঠলো, কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বললে, তুমি আশ্চর্য হবে জানি, কিন্তু আমি সঠিক জবাব চাই। 'না' বললে আমি খুশিই হবো, যদি তাই তোমার মনের কথা হয়।

ডাকুর কণ্ঠস্বরে একাগ্রতা প্রকাশ পেতেই লটির মুখ চোখ লাল হয়ে উঠলো। সে অন্যদিকে মুখ ফেরালে।

ডাকু বললে, তুমি ভেবে সন্ধ্যার আগে আমায় বলো। হ্যাঁ, একটা কথা। ভেবোনা এইবারের দু'দিনের পরিচয়ে, অতবড়ো একটা কথা বলে ফেললাম। নোয়াখালীতে, তখন অবশ্য খুবই ছোট—কিন্তু ছেলেবেলার সে আকর্ষণের পরিণতির পরিচয় পাই দার্জিলিং-এ। যাক, তোমার জীবন কি পথে চলেছে, জানিনে, হয়তো আমার ভবঘুরের জীবনযাত্রার সাথে তার আগাগোড়াই গরমিল। যদি অপ্রীতির কারণ হয়ে থাকি, ক্ষমা করো, তবে খুলে বলো, আমি জানতে চাই। না জেনে ঢের দিন গেচে, আর সংশয় সইতে পারিনে।

ডাকু উঠতেই লটি মৃদুকণ্ঠে ডাকল, ডাকুদা—

—ডাকচ ?

—হ্যাঁ।

—কি, বলবে ?

লটি চুপ করে থাকলো। তারপরে মুখ তুলে বললে, যদি আমি সন্ধ্যার আগে কিছু ভেবে ঠিক না করে উঠতে পারি ?

ডাকু দাঁড়িয়েছিলো, এইবার চেয়ারের হাতলের ওপর বসলো। বললে, বেশ অপেক্ষা করবো।

—আজই যাবে ?

—হ্যাঁ, যেতেই হবে।

—আবার আসবে কবে ?

—শিগগির নয়। ছুটি পাওয়া বড় শক্ত। তুমি লিখো।

—লিখবো।

—বেশ। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ডাকু বললে, আমার সম্বন্ধে কিছু জানতে চাও ? কোন কথা—

—দরকার নেই।

—তা'হলে চলি এখন নিচে ?

—আচ্ছা।

সন্ধ্যের ডাক গাড়িতে লটির জবাব না নিয়েই ডাকুকে কলকাতা ছাড়তে হলো। গাড়ি ছাড়বার আগের মুহূর্তে লটি বললে, আমি লিখবো।

ডাকু যাবার পর এক সপ্তাহ না যেতেই একদিন সন্ধ্যাবেলা স্বামী-স্ত্রীতে কথা হচ্ছিল। লটি বাড়ি ছিলো না। সায়েব জানতেন ব্যানার্জি পরিবারের সাথে সে এম্পায়ারে গেছে। কথাটা আংশিক

সত্য, সে ছবি দেখতে গেছে সত্য, কিন্তু গেছে বিজুতে, এবং টুটুর সাথে। এটুকু মেমসায়েবের কারসাজি।

দাস বলছিলেন, ডাকু পৌঁছে চিঠি লিখেচে। একটা অদ্ভুত খবর আছে। সে লটিকে বিয়ে করতে চায়।

—Heavens ! ওই ভূতটার সাথে লটির বিয়ে! কি স্পর্ধা! Unmannerly half-civilised boor—

—তার মানে? সোসাইটির সঙগুলোর মতো ইংরেজী বুক্‌নী কাটেনা, কথায় কথায় দিব্যি গালেনা, বেপরোয়া মদ্যপান করে না, এই তো। আমার ডাকুকে ভালো লাগে।

—তা লাগুক। বিলেত যায়নি, একটা আস্ত জানোয়ারই তো রয়ে গেচে এখনো। সমাজেও ওর কোন স্থান নেই।

—একবার বিলেত ঘুরে এলেই জানোয়ারত্ব ঘুচে যেতো? আমাকেও তা'হলে জানোয়ারের দলে ফেলচো তো?

মেমসায়েব কথাটা বলে ফেলেই লজ্জিত হয়েছিলেন। বললেন, তা নয়, তা নয়। আমি ঠিক বোঝাতে পারচি না, অর্থাৎ, set-এর বাইরে একজন অজানা অচেনা—

দাস সায়েব বাধা দিয়ে বললেন, একটু সমঝে। তুমি যে ডেপুটির স্ত্রী, একথা তুমি ভুললেও, বাঁড়ুজ্যে মল্লিক পরিবারের কেউই এক লহমার তরে ভুলবেনা জেনো। শঙ্কর রায়ের সাথে মেয়ের বিয়ে দিলে তোমার অমর্যাদা হবার ভয় নই। সোসাইটির গিন্নীদের জিগ্যেস করে দেখো, যে ওর সাথে মেয়ের বিয়ে দিতে পারলে তাঁদের অনেকেই বর্তে যাবেন। ও যে কাজ করে, সে কাজ পাবার জন্যে বহু বিলেত ফেরৎ মল্লিক-বাঁড়ুজ্যের ছেলে জুতোর তলা খুইয়ে ফেললে। কাদের

নিয়ে তোমার set লীলা ?• নিজের দেশে পরদেশী, এ্যাকটিং এবং কৃত্রিম জীবনযাপনে অভ্যস্ত জনকয়েক তাসের সায়েব-বিবি। রাস্তার ভিখিরীর যা কালচার, যা tradition, তাদেরও তাই,—তফাৎ শুধু সিল্ক স্যুট ও ছেঁড়া-কাঁথার। সে অত্যন্ত স্থূল তফাৎ। যাক। তর্ক বৃথা। আমি নিজে মনে করি তোমার টুটু মল্লিকের চেয়ে ডাকু অনেক উঁচু দরের ছেলে।

—টুটুর নাম করচো কেন ? সে কী করলে তোমার ?

—করেনি কিছু, কিন্তু ওই একটি লোক আছে, যাকে দেখলে আমার গা জ্বলে যায়।

—গা তোমার জ্বলে যেতে পারে, কিন্তু এই তোমায় বলে রাখচি আমি, তার চাকর থাকবার যোগ্যতাও নেই তোমার ডাকুর।

টুটুর প্রতি দাস সায়েবের মনোভাবের আঁচ মিসেস পেয়েছিলেন, তাই লটির সাথে তার মেলামেশাটাকে যতদূর সম্ভব আড়াল করে রাখতেন। শুধু আড়াল নয়, মেলামেশার সুযোগ ঘটাতেও মেয়ের প্রতি তাঁর হিপ্নোটিজম বিদ্যার প্রয়োগ করতে হোত প্রায়ই।

তাঁর প্রথম থেকেই ইচ্ছে টুটুর সাথে সম্পর্কটা পাকা করে ফেলেন। তা'হলে সিভিলিয়ান বৈবাহিক সুবাদে ডেপুটিজায়াত্বের হীনতাটুকু একেবারে শেষ হয়ে যায়। টুটুর সম্বন্ধে যে সব কথা কানে আসে, সোসাইটিতে সে সব তো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। ও বয়েসে ও-রকম একটু আধটু সব ছেলেরই হয়।

কিন্তু স্বামীর বর্তমান মনোভাবে এ অভিলাষ প্রকাশে অনেক বিপদ। তাই সর্বাগ্রে তিনি মেয়েকে পোষ মানাবার ফিকিরে ছিলেন।

দাস সায়েব একখানা বইয়ে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ

পরে মৌনতা ভঙ্গ করে বললেন, তাইতো, রাত হয়ে চললো যে! Time they were back !

মিসেস বললেন, কটা বেজেচে ?

—ন'টা।

—ভারী রাত হয়েচে। দশটার আগে তো ছবিই শেষ হবে না।

দাস সায়েব কথা কইলেন না। বই হাতে আপিস কামরার দিকে উঠে গেলেন। মেমসায়েব লাইব্রেরীতে চিঠি লেখা নিয়ে বসলেন।

লটির মনের গভীরতা ছিলোনা বললে ভুল হবে; কিন্তু সে গভীরতার ওপরের জলরাশি ছিলো ঘোলাটে। তাই তরঙ্গ উঠলে আলোড়ন তলস্পর্শ করতো না। কিন্তু ইদানীং যেন সে নিয়মের ব্যতিক্রম হতে স্বুরু হয়েছিলো।

দৈনন্দিন জীবনযাপনের কৃত্রিমতার চাপ তাকে মাঝে মাঝে পীড়া দিত। মাঝে মাঝে মনে হ'তো, সমাজটা যেন একটা দানব, যেন কি এক উগ্র নেশায় মত্ত হয়ে চালকহীন রেলগাড়ির ইঞ্জিনের মতো ভীমবেগে চোখ লাল করে ছুটে চলেচে—কোনো রকমে পায়ের তলায় লাইন দু'টো বেঁকে বসলেই ধ্বংস অনিবার্য। কোন আশা, কোন মঙ্গলের সম্ভাবনাও নেই—ঝোড়ো হাওয়ায় যেন তীব্র হিংস্র বিদ্রূপ, টিটকারী দিয়ে মাতামাতি করে বেড়াচ্ছে।

আতঙ্কে তার অন্তর আর্ত হয়ে উঠতো।

ঠাণ্ডা মাথায় মাঝে মাঝে সে ভাবতে বসতো। পড়বার বাতিক তার চিরদিনই ছিলো, কিন্তু পড়ে সে সম্বন্ধে ভাববার অভ্যেস ছিলো না। এইবারে সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে সব কিছু দেখতে গিয়ে এই

কথাটাই তার বারে বারে মনে হত যে, সুন্দরের অভাবের অবস্থাটা হয়তো তবু সওয়া যায়, কিন্তু অসুন্দরের উপস্থিতি অসহ্য।

তার এ ক্ষণিক উন্মেষের আয়ু দীর্ঘ হ'তো না, ভগ্নস্তূপের ক্ষণদ্যুতি স্ফূলিঙ্গের মতো চরম পরিণতির দিকে ঢলে পড়তো।

আজ টুটু মল্লিকের সাথে বেরোতে তার যথেষ্ট আপত্তি ছিলো, কারণ অনেক। কিন্তু একটিও বলা হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া মা-কে কথা দেওয়া হয়ে গিয়েছিলো।

একটি জিনিষ সে বুঝেছিলো, মল্লিকের সাথে ঘনিষ্ঠতা মা-র কাম্য। কিন্তু যা বোঝা তার সর্বাগ্রে উচিত ছিলো, অর্থাৎ এ আত্মীয়তার ওপর তার নিজের মন বিরূপ, সেইটেই সে পরিস্কার বোঝেনি।

ছবি সাড়ে আটটায় ভাঙলে, বেরিয়ে লটি বললে, আমি বাড়ি যাবো, আমার মাথা ঘুরচে।

টুটু বললো, I say, what—মাথা ঘুরচে, এতো ভালো কথা নয়! Let us have some food first—খাবার সময়ও হয়ে গেচে।

—খাবার জন্যে নয়। তুমি যে কোল্ড-ড্রিংক দিলে এনে, সেইগুলো খাবার পর থেকে। বিচ্ছিরি ঝাঝ লাগলো।

টুটুর ঠোঁটের ধার দিয়ে পাৎলা হাসি উঠেই মিলিয়ে গেল। বায়স্কোপে প্রারম্ভিক দু'পেগে তার পানতৃষ্ণা কেবল বৃদ্ধিই পেয়েছিলো। তাই সে অধিক বাক্যব্যয় না করে বললে, still, খেতে তো হবে। চলো ফার্পোতে।

হোটেলে ঢুকে লটি বললে, তুমি কিছুতেই drink করতে পাবেনা। মাতালের সাথে ঘুরতে ভয় করে।

টুটু বললে, মাতাল? কি যা-তা বোলচো? হুইস্কি অবশ্যই আমি

খাই, কিন্তু তা ব'লে—যাক। I say, তোমার মাথা ঘুরচে বলছিলে না, দাঁড়াও let me get soothing something for you—

—আমি কিছু খাবো না।

—এখানে scene ক'রো না। শেষে মাথা ঘুরে পড়ে-টড়ে যাবে, একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড হবে।

জিন মেশানো জিঞ্জারের প্রভাবে লটির মাথা তখন বেশ ঝিমঝিম করছিলো। সে আর কথা বললে না।

ডিনার যখন শেষ হলো, তখন রাত সাড়ে দশটা। ততক্ষণে টুটুর ছ'পেগ হুইস্কি ও ছ'টো কক্‌টেল এবং লটির চারটে 'soothing something' শেষ হয়ে গেচে।

নিচে গাড়িতে এসে টুটু বললে, what about a long drive ? বাড়ি যাবার আগে বুঝেচ তো—একটু মাথাটা ঠাণ্ডা—

লটির কিছু বলবার মত অবস্থা ছিলো না। সে জড়িত-স্বরে একটা কি বলবার চেষ্টা করে টুটুর কাঁধে মাথা রাখলে।

শিস্ দিয়ে টুটু এ্যাকসেলারেটারে পা দাবালে। কলকাতার রাস্তা পার হয়ে গাড়ি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে অপ্রকৃতিস্থ বেগে ছুটলো।

রাত দেড়টায় বাড়ি ফিরে, মিসেসের সুবন্দোবস্তে লটির নিজের ঘরে পৌঁছোতে বিশেষ কষ্ট পেতে হয়নি বটে, কিন্তু তার চেহারা দেখে মিসেসের মন শঙ্কাকুল হয়ে উঠলো। অনবরত দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে থাকতে থাকতে লাল ঠোঁটে গভীরতর লাল দাগ কেটে দাঁত বসে গেছে। চোখ ছ'টোর রঙ হয়েচে অস্তসূর্যের আলোয় বর্ষার নদীর ঘোলা জলের মতো। চুল অবিন্যস্ত, উড়ছে।

সারা বিনিদ্ররাত লটির মুদিত চোখের ওপর বায়স্কোপের ফিতের মতো অস্পষ্ট দুঃস্বপ্নের ছায়া ঘুরতে লাগলো। পাশবালিশের সুখকর উত্তপ্ত আলিঙ্গনের সাথে সাথে মত্ত টুটু মল্লিকের প্রসারিত বাহুর বিভীষিকা ফুটে উঠতে লাগলো।

নারীজীবনের প্রথম জৈবযজ্ঞে নিহত, নিশ্চেতন মানসকে আবরণ করে, তার সর্বাঙ্গ অসহায় ভীতিতে থেকে থেকে শিউরে উঠতে লাগলো।

দিন যায়, ডাকুকে আর লেখা হয়ে ওঠে না। লেখবার মতো গুছিয়ে কথাও জোগায় না, লিখব বলে তোড় জোড় করে বসতেও আলসেমি লাগে। লটি যেন দিন দিন ছনমনে হয়ে উঠছে।

সে হঠাৎ অসামান্যা রূপসী হয়ে উঠেছে। দেহ-তটে যৌবনের বাঁন ডেকেছে। পাড় উপচে পড়ো পড়ো। কিন্তু চোখের কোনে চিন্তার কালিমা গাঢ়তর হয়ে উঠেছে।

মিসেসের মন খুব ভালো। লটি কোনদিনই তার অবাধ্য ছিলো না। এখন যেন আরো বাধ্য হয়েছে। টুটুর সাথে বেরোতে তার আপত্তি নেই, আর্মি নেভি-র সেলেও দিনে দুপুরে, যখন তখন, সে মায়ের সাথে বিনা ওজরে বেরিয়ে পড়ে। মিসেস এমনও আশা করেন যে, টুটুর সাথে আর একটু ঘনিষ্টতা চোখে পড়লেই, তিনি সম্বন্ধের কথাটা পাকাপাকি করে ফেলবেন। তাঁর মনে ডাকু-ঘটিত একটা আশঙ্কার কারণ সর্বদাই জাগরুক ছিলো, বিশেষ করে দাস সায়েবের মনোভাবের পরিচয় পাবার পর থেকে। Absurd, তাহলে সমাজে বাস ওঠাতে হবে। মল্লিক বাড়িতে তিনি আর যাবেন কোন মুখে।

সেদিন মল্লিকের বাড়িতে ডিনার ছিলো, ডিনারের পর সবাই বসবার কামরায় সমবেত হ'লে, ভায়োলেট মিত্তির লটিকে একলা বারান্দায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, চলো একটু বেড়াই।

—চলো।

কিছুক্ষণ ফুলের বেডের ধার দিয়ে ঘোরবার পর হঠাৎ ভায়োলেট বললে, I say Lottie what has Tutu done to you—I mean—

লটির মুখ সহসা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে হঠাৎ লাল হয়ে উঠলো। সে অস্ফুটস্বরে বললে, কিছু না।

ভায়োলেট ঐকান্তিক সৌহার্দ্যের সুরে বললে, সে বুঝলুম। কিন্তু তুমি তো বেবি নও লটি, আত্মরক্ষার এডুকেশনও কি তোমার হয়নি? —Or are you thinking of getting stuck to that worm? আমি অনেক আগেই এঁচেছিলুম কিন্তু—, তারপর ক্ষুণ্ণভাবে বললে, আমার উচিত ছিলো তোমায় সাবধান করে দেওয়া। তোমার মা জানেন?

লটি মৃদুস্বরে বললে, আমি বলিনি।

—বলে ফেলো, আর দেরি করো না। এমনিই বোধ হয় দেরি হয়ে গেচে।

অজ্ঞাত বিভীষিকায় লটির সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠলো। তার আচ্ছন্ন মননে যে সব কথা রূপ পরিগ্রহ করে উঠতে পারেনি, ভায়োলেটের খোলাখুলি কথাবার্তার পর সে সব জোয়ারের জলের মতো তার চিন্তাকে প্লাবিত করতে লাগলো—

রাতে বাড়ি ফিরে সে ডাকুকে চিঠি লিখতে বসলো। একান্ত

নির্ভরের স্বপ্নে তার চোখের সামনে চওড়া একখানা বুকের ছবি ভেসে উঠতে লাগলো। চিঠি লিখে, সীল করে, সে যখন উঠলো, তখন রাত আড়াইটে।

মায়ের কথাতেই তার জীবন নিয়ন্ত্রিত, অথচ জ্ঞান হবার পর যেচে তাঁকে কিছু বলতে যাওয়ার স্মৃতি মনে আসেনা। আজ এই অসম্ভব সময়ে পা টিপে টিপে মায়ের ঘরের সামনে গিয়ে ডাকলে, মা—

সে রাত মায়ের ঘরে, মায়ের পাশে শুয়ে কাটলো।

ডাকুর চিঠির জবাব আসেনা। লটির দিন কাটেনা। একা ঘরে থাকা আর ওষুধ খাওয়া—এই কাজ। তার অসুখ।

তার অসুখ, সেই দুশ্চিন্তায় দাস সায়েবের মাথার সব কটা চুল সাদা হয়ে উঠলো। সে শুনেছে, টুটুর সাথে তার বিয়ের প্রস্তাবে আপত্তি উঠেছে। আপত্তিকারী টুটু নিজে। কানাঘুষো শোনা যায়, সে বিলেতে বিয়ে করে এসেছে; তার বিলিতি স্ত্রী চিঠি দিয়েছে, আসচে।

মিসেস হাল ছাড়েন না। মনে মনে ঠিক করেন, সার এস. এন্-এর ভাইপো অরুণ সিভিলিয়ান হয়ে আসছে, তার সাথে লটির বিয়ে দেবেন। এই আপদটা এখন ভালোয় ভালোয় চুকলে হয়।

লটিকে দেখতে যাঁরা আসেন, মিসেস অদম্য উৎসাহে তাঁদের তোয়াজ করে বিদেয় করেন। লটির কাছে ঘেঁষতে দেন না।

তারপর একদিন, এমন করে দিন কাটাবার আর আবশ্যক রইলো না। বাথরুমে গোঙানী শুনে ছুটে গিয়ে সংজ্ঞাহীন লটির ভূপতিত দেহ আবিস্কার করলেন, যন্ত্রপাতি, ডাক্তার—সব মিথ্যে হ'লো, সে

কাহিনীর বিশদ বর্ণনা অনাবশ্যক। তারই পরিণতির সূত্রেই এ আখ্যায়িকার আরম্ভ।

ডাকু কাজে লাইনে ছিল। ফিরে চিঠি পেয়ে, সে লটিকে নিতে এসেছিলো।

এইটুকু লটির জেনে যাওয়া হয়নি।

